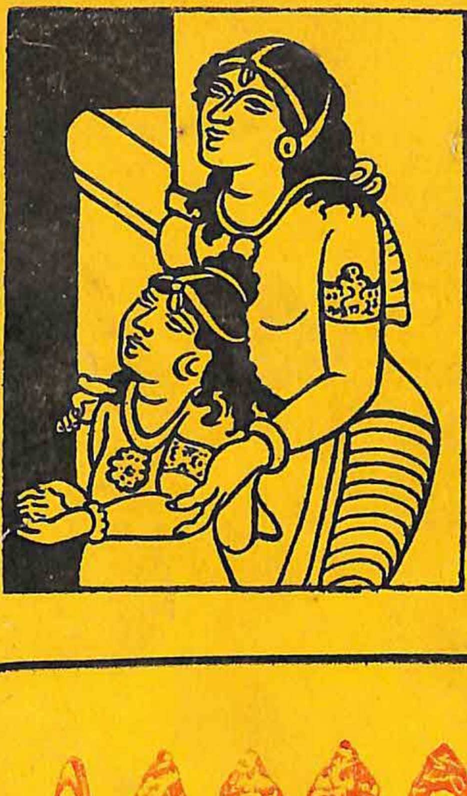
প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত





গোপালচন্দ্র রায়চৌধুরী এম.এ., পি.এইচ.ডি.(লণ্ডন)

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI, Vide Notification No. T. B. No. VI-H-79-134, dated 5. 12. 79.

প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত

[ষষ্ঠ শ্রেণী]

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
এম. এ , পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
প্রাক্তন অধ্যাপক ও রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
অস্থায়ী অধ্যাপক, এলমায়রা কলেজ, নিউইয়র্ক স্টেট্
এবং
অষ্টিন্ কলেজ, শেরম্যান, টেক্সাস স্টেট্, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট :: কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১/১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ
পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৮৩

মূল্য : টাকা ৯·৪০ মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীঅমলচন্দ্র বসাক
সারদা প্রেস
১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

[পঞ্চম অধ্যায়]

প্রাচীন সভ্যতার ধারা

প্রথম অধ্যায় ঃ প্রথম পাঠ

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ?

ইতিহাস বলতে বোঝায় পূর্ববৃত্তান্ত, পুরাবৃত্ত, প্রাচীন কথা। কিন্তু এই শব্দটি সাধারণতঃ আমরা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি। অর্থাৎ ইতিহাস বলতে আমরা সচরাচর বুঝি আমাদের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারের সেই অংশ যা থেকে আদিকাল হতে মানুষের সামাজিক অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের কথা জানা যায়।

পণ্ডিতদের অনুমান, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে। আমাদের এই সুদূর অতীতের পূর্ব-পুরুষরা ছিল একেবারেই জংলী। তারা বনে-জঙ্গলে বাস করতো; আর ফল-মূল আহরণ এবং শিকার ধরে জীবনধারণ করতো। তাদের চেহারার সঙ্গে বনমানুষের চেহারারই বেশী মিল ছিল।

এর পরবর্তীকালে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়। বুদ্ধি-বিবেচনাও বাড়তে থাকে। কিন্তু তখনও তারা বন্যই থেকে গেল।

এখন থেকে প্রায় দশহাজার বছর আগে একদল মানুষ পশু-পালন ও চাষবাস করে খাদ্য-উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করে। তখন এরা আর বনে-জঙ্গলে না ঘুরে যেখানে চাষবাসের সুবিধা, সেই সব জায়গায় ঘর বাঁধে। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শেখে। এর ফলে গ্রাম, ঘর, বাড়ি ও যাতায়াতের পথঘাটের সৃষ্টি হলো। এইভাবে সর্বপ্রথম সভ্য জীবন-যাপনের পথ খুলে গিয়েছিল।

আরও পাঁচ-ছয় হাজার বছর পরে মানুষ শহর গড়ে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত করে। এই একই সময়ে লেখার পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়। এই নতুন পরিবর্তনের ফলে মানুষ সম্পূর্ণ সভ্য হলো।

এরপরে ধাপে ধাপে মানুষের জীবনযাত্রা আরও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। আজ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে বশে এনে মানুষ এক সুমহান্ সভ্যতার অধিকারী হয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীর নীচে-উপরে, দিগন্তবিস্তৃত আকাশে, অসীম সমুদ্রের তলদেশে—সর্বত্র তার অবাধ গতি। চাঁদে গিয়েও সে কয়েকবার ঘুরে এসেছে। কিন্তু মানুষের সবরকম কৃতিত্বের মূলে আছে সুদীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। সে ধাপে ধাপে কিভাবে সভ্যতার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছিল তা-ই জানবার এবং বুঝবার জন্যই আমরা ইতিহাস পড়ি।

দ্বিতীয় পাঠ

প্রাচীন কালের মানুষের কথা কি করে জানা যায়

আমরা দেখেছি, মানবজাতির বয়স প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর। লেখার আবিষ্কার হয়েছিল মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে। পুঁথি-পত্র লেখা শুরু হয়েছিল আরও অনেক পরে। কাজেই মানুষের সুদীর্ঘ জীবন-বৃত্তান্তের দশভাগের নয় ভাগই আমাদের অজানা রয়ে গেছে। সে যুগে এখনকার মত কাগজ তৈরি হতো না। বইগুলি লেখা হতো মাটির টালি, চামড়া, তালপাতার উপর। এগুলির বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই প্রাচীন কালের মানুষদের কথা জানা সহজ নয়। কিন্তু কয়েকটি উপায় আছে। সে কথাই এখন বলছি।

(১) **প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ** পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রাচীন যুগের মানুষের কঙ্কাল, বহু পুরানো অস্ত্রশস্ত্র, বর্ণাঢ্য চিত্র, কারুকার্য-মণ্ডিত মৃৎপাত্র, অলঙ্কার এবং আরও অনেক মূল্যবান তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। এমন কি পুরানো শহর, ঘরবাড়ি, জমকালো রাজ-প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের ধুলোমাটির নিচে এগুলি চাপা পড়ে গিয়েছিল। পণ্ডিতগণ মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার এই সকল মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। তাই দেখেই আমরা সেকালের মানুষের অনেক কথা জানতে পারি। এগুলি কবে তৈরি হয়েছিল তাও পণ্ডিতরা মোটামুটি বলতে পারেন।

কিন্তু মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া জিনিসপত্র দেখে সেকালের সব কথা জানা যায় না। কিছুটা কল্পনা করেও নিতে হয়।

(২) **উৎকীর্ণলিপি ঃ** সেকালের রাজারা অনেক সময় তাঁদের কীর্তি-কাহিনী মন্দির, রাজপ্রাসাদের দেওয়াল এবং পাথরের স্তম্ভে খোদাই করে রাখতেন। এই রকম লেখাকে বলা হয় "উৎকীর্ণলিপি"। তাঁদের সম্বন্ধে জানতে এই সকল লিপি আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু এই লিপিগুলির ভাষা বা অক্ষর এখনকার মতো নয়। তাই এগুলি পড়া সহজ নয়। যাঁরা প্রাচীনকালের ইতিহাস চর্চা করেন, তাঁরা এসব লিপি পড়তে শিখেছেন, তাতে কি লেখা আছে তাও তাঁরা বুঝতে পারেন।

(৩) **প্রাচীন মুদ্রা ঃ** উৎকীর্ণলিপি ছাড়া মাটির নিচে কখনও কখনও প্রাচীনযুগের কিছু কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। কোনো কোনো মুদ্রার ওপর সে-কালের রাজাদের প্রতিকৃতির ছাপ এবং সন-তারিখ লেখা আছে। এমন কি কতকগুলি মুদ্রাতে উল্লেখযোগ্য ঘটনারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন মুদ্রাগুলিও ইতিহাস-রচনায় সাহায্য করে।

(৪) **প্রাচীন পুঁথিপত্র ঃ** সেকালের লোকদের কথা সবচেয়ে বেশি জানা যায় তখনকার যে সব পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে, যেমন—বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি থেকে আমরা আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কাহিনী জানতে পারি। এই একই রকমভাবে বাইবেল থেকে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের প্রাচীন ইতিহাস এবং হোমারের লেখা ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে গ্রীক-জাতির আদি ইতিহাস জানা যায়।

(৫) **বিদেশী পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ঃ** প্রাচীন যুগের অনেকে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এঁরা অনেকে নিজেদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে রেখে গেছেন। এগুলি থেকেও সেকালের অনেক কথা জানা যায়। এই সকল ভ্রমণকারীদের মধ্যে গ্রীকজাতীয় হেরোডোটাস্ এবং মেগাস্থিনিস্, চীনদেশীয় ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙ, মুসলিম ধর্মাবলম্বী সুলেমান ও অলবেরুনী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালের কথা আজও আমরা পুরোপুরি জানতে পারিনি। কিন্তু পণ্ডিতরা হাল ছাড়েননি। তাঁরা আরও বেশী জানবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে আমরা যা জানতাম আজ তার চেয়ে অনেক বেশী জানি, ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক কিছু জানবো।

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ইতিহাস কাকে বলে?
২। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল কবে?
৩। মানুষ কবে চাষবাস ও পশুপালন শুরু করে?
৪। মানুষ কবে লিখতে শিখেছিল?
৫। প্রাচীনকালে কিসের ওপর বইগুলি লেখা হত?
৬। উৎকীর্ণলিপি কি?
৭। প্রাচীনযুগের কয়েকটি পুঁথিপত্রের নাম কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে জংলী ছিল তার প্রমাণ কি?
২। মানুষ কিভাবে সভ্য জীবনযাপন শুরু করে?
৩। আমরা ইতিহাস পড়ি কেন?
৪। উৎকীর্ণলিপি কিভাবে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে?
৫। মুদ্রার সাহায্যে কিভাবে প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। আদিম মানুষ কিভাবে সভ্য হয়েছিল?
২। প্রাচীনকালের মানুষের কথা আমরা কি করে জানতে পারি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : নিম্নের উত্তরগুলির মধ্যে যেটি ঠিক তার পাশে √ চিহ্ন দাও :

(ক) পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয় (এক লক্ষ বছর আগে/তিন লক্ষ বছর আগে/পাঁচ লক্ষ বছর আগে।)

(খ) সেকালের একটি পুঁথির নাম (রামচরিত/মহাভারত/ব্যাকরণ কৌমুদী।)

(গ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
(১) পাথরের স্তম্ভে খোদাই করা লিপিকে — লিপি বলে।
(২) আদিমকালে বইগুলি লেখা হতো মাটির —, চামড়া ও—ওপর।
(৩) আমাদের এই সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষেরা ছিল একেবারেই—।
(৪) লেখার পদ্ধতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সম্পূর্ণ — হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রথম পাঠ

পৃথিবীর প্রথম মানুষ

অনেকে বলেন, গরিলা, শিম্পাজী প্রভৃতি বনমানুষ এবং মানুষ একই পূর্বপুরুষের বংশধর। তাই বনমানুষদের চেহারার সঙ্গে আদি মানুষের চেহারার অনেক মিল পাওয়া যায়। তবে তফাতও ছিল অনেক। পণ্ডিতগণ যাদের "প্রথম মানুষ" বলে চিহ্নিত করেছেন তারা দুপায়ের উপর ভর করে টান হয়ে হাঁটতে পারতো। তাদের হাতের গড়ন ছিল এমন যে, তারা তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেমন খুশি তেমন কাজকর্ম করতে পারতো। এদের মগজও ছিল বেশ বড়ো।

যতদূর জানা যায়, মানুষ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল প্রায় দেড় কোটি বছর আগে। সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় একরকম খর্ব-কায় প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। তারা সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো, হাত ঘুরিয়ে কাজ করতে পারতো। কিন্তু তাদের মগজ ছিল গরিলাদের মতো ছোটো।

এদিকে মানুষ জন্মাবার লক্ষণ আরও কয়েকটি স্থানে প্রকাশ পাচ্ছিল। অবশেষে যবদ্বীপ, চীন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের কয়েকটি স্থানে একদল প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মুখের ও দেহের গড়ন ছিলো বনমানুষ এবং মানুষের মাঝামাঝি। পণ্ডিতগণ এদেরই "প্রথম মানুষ" বলে আখ্যা দিয়েছেন। এদের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে "পিথেক্যান্থোপাস্" অর্থাৎ "বানররূপী মানুষ"।

এই প্রথম মানুষদের এক উন্নততর গোষ্ঠী চীন দেশের শহর পিকিং-এর কাছে বাস করতো। তাই এরা "চীনের মানুষ" বলে পরিচিত। এরা পাহাড়ের গুহায় থাকতো আর খাদ্য সংগ্রহের জন্য বড় বড় জন্তু-জানোয়ার শিকার করতো। মানুষ প্রকৃতির শক্তিগুলিকে জয় করে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল চীনের বানররূপী মানুষরা। তারা এখন থেকে প্রায় তিন লক্ষ বছরের কিছু আগে আগুন জ্বালাবার কৌশল আবিষ্কার করেছিল। এই আবিষ্কারটির তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। আদি মানুষ তখন থেকে পুড়িয়ে এবং ক্রমে রান্না করে খেতে শিখল। আগুনের তাপ দিয়ে সে দুরন্ত শীতকে জয় করল। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকেও সে নিরাপদ হল। তারপর ক্রমে সে পোড়ামাটির বাসন তৈরি করতে শিখল; তার চেয়েও বড় কথা, এক সময় সে নানা-রকম ধাতু গলিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও পাত্রাদি তৈরি করবার পথ আবিষ্কার করে ফেলল। এই ভাবে আগুনের নানারকম ব্যবহার শিখে মানুষ ক্রমেই সভ্যতার পথে এগিয়ে চলতে শেখে।

এর পরবর্তীকালে পশ্চিম ইউরোপে এবং পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি স্থানে একরকমের মানুষ দেখা দেয় যাদের চেহারা ও মগজের আয়তন অনেকটা এখনকার মানুষের মতোই ছিল। কিন্তু তারা কালক্রমে লোপ পেয়ে যায়। তারপর ধাপে ধাপে আমাদের মতো দেখতে মানুষের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিতদের অনুমান, এই ঘটনাটি ঘটেছিল পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে "হোমোস্যাপিয়েন" অর্থাৎ "সবজান্তা মানুষ"।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষের জন্ম

" " তিন লক্ষ বৎসর পূর্বে আগুন জ্বালাবার কৌশল আবিষ্কার

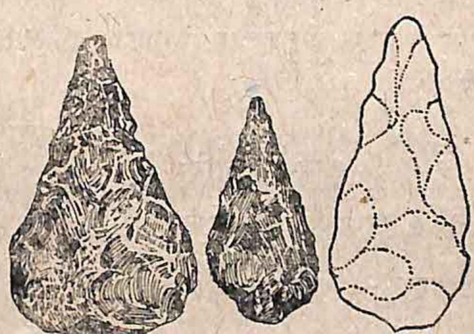
" " ৩৫ থেকে ৫০ বছর আগে আমাদের মত দেখতে মানুষের জন্ম।

দ্বিতীয় পাঠ

ক. প্রাচীন প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার

মানুষ হাতিয়ার তৈরি করে প্রাণিজগতের রাজা হয়েছিল। প্রথম হাতিয়ারগুলি তৈরি হতো পাথর দিয়ে। হাতিয়ারের গড়ন দেখে মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। এর আদি ভাগের নাম প্রাচীন প্রস্তর-যুগ; শেষের ভাগটিকে বলা হয় নব-প্রস্তরযুগ।

মানুষের প্রথম হাতিয়ার ছিলো পাথর-ভাঙা নুড়ি। এর খসখসে দিক দিয়ে কাটবার এবং চিরবার কাজ চলতো। এরপরে দেখা যায় যে "বানররূপী মানুষে"র যুগে আর একটু অগ্রগতি হয়েছে। এরা



প্রাচীন প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার

বেশ শক্তপোক্ত পাথরের চিল্‌তা খসিয়ে একরকম ডিম্বাকৃতি হাতিয়ার তৈরি করেছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে "হাতকুড়াল"। এগুলি দিয়ে কাটা, মাটি খোঁড়া, ঘা মেরে মাথা ভাঙা—সব রকম কাজই চলতো। এই সময় থেকে মানুষ বড়ো বড়ো জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে শুরু করে।

এখন থেকে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে দেখা যায় যে, এক নতুন জাতের মানুষ হাতকুড়ালগুলিকে তেকোণা করে একটু ছুঁচলো করেছে। তাছাড়া এরা পাথরের চিল্‌তাগুলিকে ফেলে না দিয়ে

দুটি নতুন রকমের হাতিয়ার তৈরি করেছিল। একটি ছুরির কাজ করতো, অন্যটি চামড়া পরিষ্কারের কাজে লাগতো।

যখন আমাদের মতো দেখতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়, তখন তারা পূর্বপ্রচলিত অস্ত্রগুলির সংস্কার সাধন করেই ক্ষান্ত হলো না। যতই দিন যেতে লাগলো ততই শিকার করার প্রয়োজনে আবিষ্কৃত হলো তীর, ধনুক এবং বর্শা। তারপর তৈরি হলো বাটালি এবং তুরপুনের মত যন্ত্র। এগুলির সাহায্যে পাথর ছাড়াও হরিণের শিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি নিয়ে কাজ শুরু হলো। তখন বর্শা ও তীরের ফলক হলো আরও সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ। মাছ ধরার জন্য তৈরি হলো "হারপুন"; এবং চামড়া সেলাই করার জন্য তৈরি হলো ছিদ্রযুক্ত হাড়ের তৈরি সূঁচ। তখন থেকে কোনো কোনো মানুষ চামড়ার পোশাক পরতে শুরু করে। এছাড়া এই সময় প্রথম চামড়ার তৈরি তাঁবুরও সন্ধান পাওয়া যায়। এইভাবে পুরানো প্রস্তর-যুগের শেষ অধ্যায়ে আদিমতম মানুষের হাতিয়ারের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

স্মরণীয় তারিখ

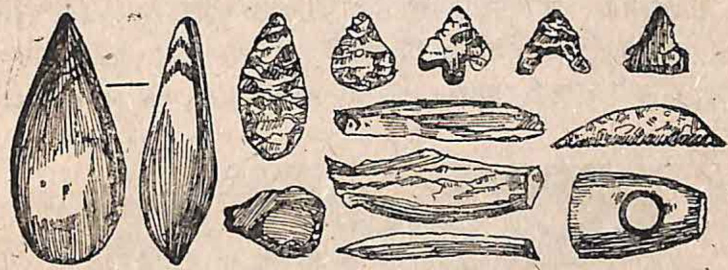
খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৫ লক্ষ থেকে ১০ হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রাচীন প্রস্তর-যুগ,

খ. নব প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার ও জীবনযাত্রা

খ্রীস্টপূর্ব প্রায় দশ হাজার বছর আগে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের অবসান হয়। মানুষ সভ্য হবার পূর্বের আটানব্বই ভাগই কেটেছিল আদিযুগে। তারপর এমন একটা পরিবর্তন দেখা দিলো যাতে তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। একে বলা হয় "নব প্রস্তর-যুগের বিপ্লব"। এর মূলে ছিল প্রধানতঃ উন্নত ধরনের হাতিয়ার, কৃষির আবিষ্কার ও পশুপালন। এই সময় থেকে মানুষের বন্যভাব ঘুচে গেল। সে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে।

নতুন যুগের হাতিয়ার: প্রাচীন প্রস্তর-যুগের হাতিয়ারগুলি দেখতে ছিলো অমসৃণ খসখসে ।নব প্রস্তর-যুগের মানুষও পাথরের

হাতিয়ার ব্যবহার করতো। তারা পুরানো যুগের হাতিয়ারগুলিকেই ঘষে-মেজে আরও ভালো, আরও চকচকে, আরও ধারালো করে তুলেছিল। তোমরা বুঝতেই পারছো যে, এতে তাদের কাজের অনেক



নব প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার

সুবিধা হয়েছিল। এছাড়া এরা কয়েকটি নতুন হাতিয়ার তৈরি করেছিল—যেমন গাছের ডাল কাটার জন্য কাটারি, বড় বড় গাছ কেটে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য হাতল-লাগানো কুড়াল, মাটি কাটবার জন্য কোদাল, ঘাস কাটবার জন্য কাস্তে এবং কাঠ চিরবার জন্য করাত।

কৃষি : এই সকল নতুন হাতিয়ারের সাহায্যেই কৃষিকাজে বিস্তার সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। একজন পণ্ডিত বলেছেন যে, কৃষির আবিষ্কারক ছিল মেয়েরা। সেকালে পুরুষেরা শিকার করে আনতো, আর শাকসব্জি ফলমূল যোগাড় করতো মেয়েরা। পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে যব, গম প্রভৃতি শস্য আপনা হতেই জন্মাতো। মেয়েরা দেখলো এই সকল শস্যের বীজ মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিলে গাছ হয় এবং তাতে ফলও ধরে। তখন তারা নিজেদের বাসভূমির কাছাকাছি মাটি কুপিয়ে দু-চার রকম শাক-সব্জি এবং শস্য ফলাবার কাজে লেগে যায়। এইভাবেই কৃষির জন্ম ও ক্রমে মেয়ে-পুরুষ উভয়ের সাহায্যে তার বিস্তার ঘটেছিল।

পশুপালন : এদিকে পুরুষেরা দেখলো যে, কতকগুলি জীবজন্তু জ্যান্ত ধরে এনে ঘরে রাখলে তারা বেশ পোষ মানে—যেমন গরু, ভেড়া, ছাগল, শুয়োর। কি করে এদের বংশবৃদ্ধি করতে হয় তাও তারা বুঝতে পারলো। এইভাবে পশুপালন শুরু হলো। তখন আর শিকারে যাবার বিশেষ প্রয়োজন রইলো না। গৃহপালিত পশু তাদের

মাংসের যোগান দিল। এদের দুধও মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করল। কৃষি এবং পশুপালন এই দুই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে শিকারী মানুষ পরিণত হলো খাদ্য-উৎপাদক মানুষে।

মৃৎপাত্র ঃ এবার আর এক রকমের সমস্যা দেখা দিল। কি করে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা যায়? কি করেই বা রান্না-বান্না করা যায়? এরও সমাধান করতে মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল। এরা নরম হাতে



কাদামাটি দিয়ে বাসন তৈরি

এঁটেল কাদামাটি দিয়ে গৃহস্থালির বাসন-কোসন তৈরি করতে শুরু করলো। এরপরে বেশ মাথাওয়ালা একজন লোক কুমোরের চাক আবিষ্কার করে। তখন থেকে তৈরি হতে লাগলো নানারকমের হাঁড়িকুড়ি, কলস, পানপাত্র এইসব। যাতে জলে গলে না যায় সেই জন্য এগুলিকে আগে থেকেই রোদে শুকিয়ে, ক্রমে পুড়িয়েও নেওয়া হতো। অনেকে আবার এগুলির গায়ে নানা রকম নক্শা কেটে, রং মাখিয়ে মনোহারী করে তুলতো।

বয়ন-শিল্পের উদ্ভব ঃ আগে মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ভাল খেয়ে-দেয়ে এদের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গিয়েছিল। তখন আর গাছের ছাল, লতাপাতা, পশুর চামড়ার আবরণ দিয়ে দেহ আচ্ছাদনের কাজ চললো না। কাপড়-চোপড়ের সংস্থান করা তখন নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এরা ক্রমে দেখলো যে, কতকগুলি গাছের আঁশ এবং ছাগল-ভেড়ার লোম থেকে সুন্দর সুতো তৈরি করা যায়। এরপরে এরা কাপড় বুনবার জন্য এক রকম চলনসই তাঁত আবিষ্কার করে। এইভাবে বস্ত্রের সংস্থান হয়েছিল। মেয়েরাই কাপড় বুনতো।

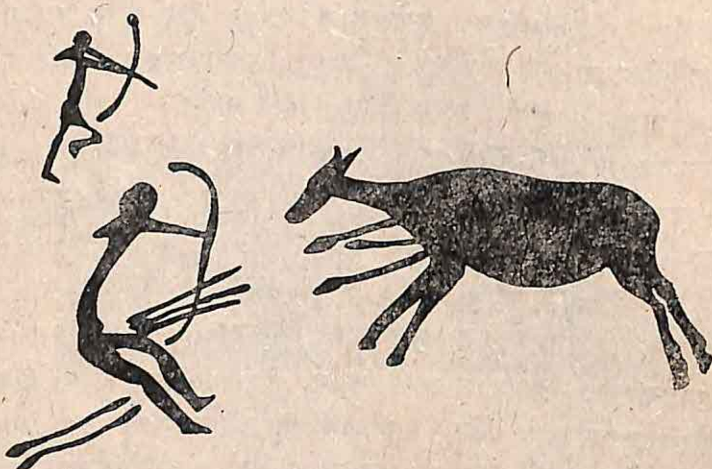
বাসগৃহ ঃ আমরা আগেই দেখেছি যে, আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষরা ছিল শিকারী। তাই তাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যাযাবর মানুষ যখন কৃষিজীবীতে পরিণত হলো তখন তার পক্ষে স্থায়ীভাবে একস্থানে বাস করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ কৃষিকার্য করে ফল লাভ করতে দীর্ঘ সময় লাগে। আবার এই সময় বোধ হয় পরিবার-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। এই দুটি কারণে মানুষকে স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধতে হলো। প্রথমে এরা মাটিতে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে তার উপর ঘাস-পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি করতো। এরপর মাটি, কাঠ, নলখাগড়া অথবা পাথরের দেওয়াল দেওয়া চৌকোনা ঘরের উদ্ভব হয়। চালগুলি ছিলো খড়ের। শত্রু এবং হিংস্র পশুর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাসস্থানের চারদিকে থাকতো মাটি অথবা পাথরের তৈরি প্রাচীর।

যানবাহন ঃ প্রথম মানুষরা পায়ে হেঁটে মাথায় অথবা কাঁধে বোঝা নিয়ে চলতো। কিন্তু পশুপালন শুরু হবার পর থেকে গাধা, গরুর পিঠেই বোঝার ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর এদের পিঠে চ'ড়ে স্থলপথে যাতায়াত করা সম্ভব হলো। কৃষির সুবিধার জন্য এরা অনেকে নদীর তীরে বাস করতো। এরা দেখলো যে, জোয়ার-ভাটার সময় মালপত্র নিয়ে জলপথে চলা আরও সহজ। এই জন্য নতুন যুগের মানুষেরা ভেলা এবং এক রকম সরু নৌকা তৈরি করেছিল।

গ্রাম-জীবনের উৎপত্তি ঃ যাতায়াতের সুবিধা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের লোক কাছাকাছি বাসা বাঁধে। এইভাবে গ্রাম-জীবনের সৃষ্টি হয়।

লৌকিক বিশ্বাস ও গুহাচিত্র ঃ আদিম যুগের মানুষের মনটা ছিলো খুবই সরল। তাদের একরকম বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মরে গেলেই মানুষের শেষ হয় না। প্রাচীন যুগের মানুষরা মৃতদেহ কবর দিয়ে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে দিতো। তাছাড়া এরা জাদুবিদ্যার প্রচণ্ড শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায়

আদি প্রস্তর-যুগের শেষের দিকে আঁকা কতকগুলি গুহাচিত্র থেকে। এর উদ্দেশ্য গৃহসজ্জা ছিলো না। এদের বিশ্বাস ছিলো ছবি এঁকে মনের ইচ্ছা পূর্ণ করা যায়। যেমন, একটা বাণবিদ্ধ হরিণ এঁকে ওরা ভাবতো যে সত্যিই একটা হরিণ পাওয়া যাবে।



গুহাচিত্র

নব প্রস্তর-যুগের কোনো গুহাচিত্র পাওয়া যায়নি, কারণ এরা গুহাতে না থেকে ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করতো। এরাও যে ছবি আঁকতো এবং জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ আছে। ফসল ফলানোর এবং বাড়াবার জন্য এরা কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো। এর জন্য যে তারা নরবলি দিতো তাও জানা যায়। মৃত ব্যক্তির কবরের উপর এরা স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করতো।

ভাষার সৃষ্টি ঃ সাধারণ জীবজন্তুরা মনের ভাব কথা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। সম্ভবতঃ আদি মানুষরাও তা পারতো না। কিন্তু তাদের নিকটতম বংশধরগণ কণ্ঠস্বর, হাবভাব, আকার-ইঙ্গিতে মনের ভাব বোঝাতে শিখেছিল। পণ্ডিতদের অনুমান, নব প্রস্তর-যুগেই কথোপকথনের জন্য প্রকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়।

মাতৃদেবতার পূজা ঃ নব প্রস্তর-যুগের মানুষরা পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে বাস করতো সেইসব অঞ্চলে পাথরের তৈরি বহু নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এ-থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, সেকালের

মানুষের মনে বোধহয় ধর্মভাবের উন্মেষ হয়েছিল, এবং তারা মাতৃ-দেবতার পূজা করতো।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ১০ হাজার থেকে ৫ হাজার বছর 'নব প্রস্তর-যুগ'

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম মানুষ কারা ?

২। প্রথম মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি দেওয়া হয়েছে ?

৩। 'চীনের মানুষ' কাদের বলে ?

৪। মানুষ আগুন জ্বালাবার কৌশল কবে আবিষ্কার করে ?

৫। এখনকার মত মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি ?

৬। 'হাতকুড়াল' কি ?

৭। হারপুন কি কাজে ব্যবহার হতো ?

৮। প্রাচীন প্রস্তর-যুগের অবসান হয় কবে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম মানুষের কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?

২। মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

৩। পুরানো যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে নতুন যুগের হাতিয়ারের পার্থক্য কি ছিল ?

৪। কৃষির আবিষ্কার কিভাবে সম্ভব হয় ?

৫। শিকারী মানুষ কিভাবে খাদ্য উৎপাদক মানুষে পরিণত হল ?

৬। যন্ত্রের প্রয়োজনীতা কেন দেখা দিয়েছিল ?

৭। মানুষকে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধতে কেন হয়েছিল ?

৮। প্রথম মানুষেরা যানবাহনের ব্যাপারে কি আবিষ্কার করে ?

৯। গ্রাম-জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে ?

১০। সেকালের মানুষেরা মাতৃদেবতার পূজা করত কেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীন প্রস্তর-যুগে মানুষ কি কি হাতিয়ার ব্যবহার করতো ? কিভাবে তারা নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি করে ?

২। নব প্রস্তর-যুগে বাসগৃহের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিয়েছিল ? আদিম যুগের মানুষের কি কি বিশ্বাস জন্মেছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ নিম্নের উত্তরগুলির যেটি ঠিক তার পাশে '√' চিহ্ন দাও ঃ

(ক) প্রথম মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম (সবজান্তা মানুষ/বানররূপী মানুষ ।)

(খ) প্রাচীন প্রস্তর-যুগে মাছ ধরবার জন্য ব্যবহার করা হ'ত (তুরপুন / হারপুন)।

(গ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(১) মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগকে দুভাগে ভাগ করা যায়। আদি ভাগের —— যুগ। শেষের ভাগটিকে বলা হয় —— যুগ।

(২) নতুন প্রস্তর-যুগে গাছের ডাল কাটার জন্য ——, বড় বড় গাছ কেটে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য হাতল লাগানো —, মাটি কাটবার জন্য—, ঘাস কাটবার জন্য —— এবং কাঠ চিরবার জন্য করাত ব্যবহার করা হতো।

———

তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রথম পাঠ

তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ

ভূমিকা ঃ নব প্রস্তর-যুগের ঠিক পরের যুগকে ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন তামা এবং ব্রোঞ্জের যুগ। এই যুগেই মানুষ প্রথম সভ্য হয়ে ওঠে। আমরা এর আগে দেখেছি যে, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষ ছিল অসভ্য বর্বর। নব প্রস্তর-যুগের মানুষদের স্বভাব-চরিত্রেরও যে বিশেষ বদল হয়েছিল তা মনে হয় না। তাহলেও এরা কৃষি এবং পশুপালনের কৌশল আয়ত্ত করে মোটামুটি খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার সমস্যা সমাধান করে ফেলেছিল। এখানে-ওখানে না ঘুরে বেড়িয়ে কি করে সুস্থির হয়ে এক জায়গায় বসবাস করা যায় তার সন্ধানও এরাই দিয়েছিল। এর ফলেই মানুষ সভ্য হবার সুযোগ পায়। তা না হলে পেতো না।

সভ্য হবার মানে কি? এর কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। যেমন, সভ্য মানুষ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবাস করে। ভালো-ভাবে বেঁচে থাকবার জন্য তারা শহর ও বন্দর, নানারকম শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি গড়ে তোলে। এসব ছাড়াও তারা সাহিত্য,

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতির চর্চা করে মানসিক উন্নতির পথ তৈরি করে। এর অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছিল ধাতুনির্মিত হাতিয়ারের ব্যবহারের ফলে।

এখন থেকে পাঁচ হাজার কি সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ সর্বপ্রথম ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। এর সুবিধা হ'ল এই যে, এই বস্তুটিকে পিটিয়ে-পিটিয়ে ছাঁচে ফেলে যেমন-ইচ্ছা-তেমন রূপ দেওয়া যায়। তাই পাথরের চেয়ে আরও উন্নত ধরনের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরি করার সুবিধা হলো। মানুষ প্রথম আবিষ্কার করে সোনা, তামা, টিন, তারপরে ব্রোঞ্জ এবং আরও অনেক পরে লোহা। লোহার ব্যবহার শুরু হয় এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে।

ধাতু দিয়ে তৈরি প্রথম হাতিয়ার ছিল তামার। কিন্তু সেগুলি মোটেই শক্ত ছিল না। সহজেই বেঁকে যেতো। তাই এই নতুন যুগের মানুষ তামার সঙ্গে কিছু টিন মিশিয়ে একরকম শক্ত ধাতু তৈরি করলো। এরই নাম হলো ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জের হাতিয়ার তৈরি করার পর থেকে মানুষের মধ্যে সভ্যতার লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ হতে থাকে।

শহরের সৃষ্টি ঃ আমরা এর আগে দেখেছি যে, নব প্রস্তর-যুগে ছোটো ছোটো গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারপর কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য যেখানে অফুরন্ত জল পাওয়া যেতো সেখানে এসে বহুলোক একসঙ্গে বাসা বাঁধে। এইভাবে নদ-নদীর কাছের গ্রামগুলি বড় হতে থাকে ; চলাচলের জন্য পথঘাটের সৃষ্টি হয় ; মাটির বাড়ির পাশে গড়ে উঠলো হাতে তৈরি, রোদে-পোড়া ইটের বাড়ি এবং দেবদেবীর মন্দির। খাদ্য ছাড়াও মানুষের আরো অনেক চাহিদা দেখা দিলো ; ফলে গড়ে উঠলো নানা রকমের শিল্পসম্ভার ; এই করেই নদীর তীরে প্রথম শহরের পত্তন হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ক্রমে শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এর ফলে মানুষ ক্রমে শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা লাভ করলো। মোটের উপর বলা যায় শহর সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছিল মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও তাই মেটাবার প্রবল প্রচেষ্টা।

উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ আগের যুগের মানুষের প্রয়োজন

ছিল খুবই কম ; অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করেই তারা সন্তুষ্ট ছিলো। কিন্তু মানুষ যতই সভ্য হতে লাগলো ততই তাদের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য সৃষ্টি হলো নতুন নতুন শিল্পের। যে যব কারিগর শিল্পের কাজ করতো তাদের মাঠে গিয়ে ফসল ফলাবার সময় ছিল না। তাই সরাসরি শস্য ফলাবার কাজ থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হলো। এদের খাইয়ে-দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব পড়ল চাষীদের উপর। এর আগে তারা তাদের নিজেদের জন্য যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করতো, এখন তার চেয়ে ঢের বেশি উৎপন্ন করতে বাধ্য হলো। একেই আমরা বলি বাড়তি বা উদ্বৃত্ত। এইভাবে আগের যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা বদলে গিয়েছিল। এতে আরো প্রমাণ হল যে, অপর মানুষকে খাটিয়ে লাভ করা যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য : প্রাচীনকালেই মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য শিখেছিল। সে নিজের তৈরি বাড়তি জিনিস অপরকে দিত আর তার কাছ থেকে নিত নিজের দরকারী জিনিসপত্র। এর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি হয়। সোনা, রূপা, তামা, টিন প্রভৃতি ধাতু সব জায়গায় পাওয়া যায় না। যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে অন্যদেশ থেকে তা নিয়ে আসতে হয়। একে বলে আমদানি করা। নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও সেযুগে যারা ধনী ছিল তারা নানা রকমের শৌখিন জিনিস ব্যবহার করতো। এরও অনেকগুলি আনা হতো অন্য দেশ থেকে। এইভাবে নতুন যুগে নানারকম প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু হয়েছিল। তখন টাকাকড়ির ব্যবহার জানা ছিল না। তাই এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস দিয়ে কেনাবেচার কাজ চলতো।

শ্রেণীবিভাগের সূচনা : প্রস্তর-যুগে মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে কোনো গোলমাল ছিল না। সবাই ছিল স্বাধীন, সবাই ছিল সমান। কিন্তু নতুন যুগে এই আদি "সাম্য-সমাজ" ভেঙে গেল। ব্রোঞ্জ ছিল একটি দুর্লভ বস্তু। বেশির ভাগ লোকের পক্ষে তা যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। কৃষির জন্য যারা ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহার করতো তাদের অনেক বেশি লাভ হতে লাগলো। এর ফল হয় এই যে, সমাজে একদল হলো ধনী, আর একদল গরীব। ক্রমে যারা অনেক

ধন-দৌলতের মালিক হলো, তারা হয়ে বসলো সমাজের মাথা। তারা নিজেরা না খেটে অন্যদের খাটিয়ে নিতো। আবার এদিকে কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি শিল্পী ও কারিগররা বংশানুক্রমে একই কাজ করতে থাকে। তারাও সাধারণ চাষীদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগে এইভাবে শ্রেণীবিভাগের সূচনা হয়েছিল।

গোষ্ঠী-বিরোধ ঃ আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে, যার শক্তি বেশি সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করে আরো বেশি শক্তিমান হবার চেষ্টা করে। সভ্যতার সূচনা থেকে আমরা মানুষের মধ্যে এই একই রকমের প্রবৃত্তি দেখি। সেকালে যে সকল গোষ্ঠী উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং জনবলে বলীয়ান ছিল তারা প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলিকে নিজের বশে আনার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়। ভালো ভালো জমিজমা অধিকার করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া সীমানা নিয়েও অনেক সময়ে কলহ দেখা দিত। এই দুটি কারণে তখন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ বাধে। ক্রমে হার-জিতের ফলে স্থানে স্থানে ছোট-বড় রাজ্য গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঃ রাজ্য তো হলো, কিন্তু রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা কি করে গড়ে উঠলো? সকল মানুষ যখন স্বাধীন ছিল, সকলের অবস্থা যখন সমান ছিল তখন কাউকে শাসন করবার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন পার্থক্য দেখা দিলো,—কেউ হলো ধনী, কেউ হলো গরীব, কেউ হলো এ-শ্রেণীর লোক, কেউ হলো ও-শ্রেণীর লোক—তখন সমাজব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ে। তাই শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন হলো। ঠিক হলো যে, সমাজে কতকগুলি নিয়মকানুন থাকবে, আর সকলকে তা মেনে চলতে হবে। যে মানবে না, তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু অন্যায় অপরাধের বিচার করবে কে? আর শাস্তিই বা কে দেবে! এর ভার যার উপর পড়লো তারই উপাধি হলো রাজা। কিন্তু ক্রমে কোনো একজনেরই পক্ষে শাসন, বিচার, শাস্তিদান প্রভৃতি—এক সঙ্গে সকল কাজ করা সম্ভব হলো না। তাই প্রয়োজন হলো মন্ত্রী, সেনাপতি এবং আরও অনেক কর্মচারীর। এইভাবে যে বিস্তৃত

ব্যবস্থার প্রবর্তন হলো, তাকেই বলা হয় সরকার ; আর রাজা, রাজ্য, রাজ-কর্মচারী, প্রজা—সকলকে একত্রে মিলিয়ে বলা হয় রাষ্ট্র। এরও সূচনা হয়েছিল এই সুদূর অতীতকালে।

কেন নদ-নদীর উপত্যকায় আদি সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল ঃ নদ-নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষরাই সর্বপ্রথম সভ্য হয়ে উঠেছিলো। এর কারণ বোঝা খুব কষ্ট নয়। অফুরন্ত জল পেয়ে নদ-নদীর তীরে জমিগুলি আপনা থেকেই উর্বর হয়ে উঠতো। তাই এই সকল অঞ্চলে খুব বেশি পরিশ্রম না করে বহু লোকের অন্নসংস্থান করা সম্ভবপর হয়। অনেক সময়ে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যেত। এছাড়া আরও একটা সুবিধা ছিল। জলপথে দূরদেশে যাতায়াত করাও অনেক সহজ। এ দুটি কারণে নদ-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বহু-লোকের সমাগম হয় এবং সেখানে ক্রমে অনেকগুলি শহর গড়ে ওঠে। এইভাবে সভ্যজীবনের জয়যাত্রা শুরু হয়।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৫ হাজার থেকে ১ হাজার বছর—তাম্র ও ব্রোঞ্জের যুগ।

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ কোন্‌টি ?
২। মানুষ সর্বপ্রথম ধাতুর ব্যবহার কবে শিখেছিল ?
৩। আদিম সাম্য-সমাজ কেন ভেঙে পড়েছিল ?
৪। রাজা কাকে বলা হতো ?
৫। রাষ্ট্র কাকে বলে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সভ্য হবার কি কি লক্ষণ থাকে ?
২। ধাতুর ব্যবহার শেখার ফলে মানুষের কি কি সুবিধা হয়েছিল ?
৩। ব্রোঞ্জ কাহাকে বলা হয় ?
৪। আদিম যুগে নদীর তীরে প্রথম শহরের পত্তন হয়েছিল কেন ?
৫। মানুষের নিত্য-নতুন চাহিদা মেটাবার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছিল ?
৬। নতুন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা কিভাবে হয় ?
৭। আদিম সমাজে ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি হয় কিভাবে ?
৮। নদ-নদীর উপত্যকায় আদি সভ্যতার উন্মেষ কেন হয় ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ নিম্নের উত্তরগুলির মধ্যে যেটি ঠিক তার পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) ধাতু দিয়ে তৈরি প্রথম হাতিয়ার ছিল (সোনার/তামার/রূপার)।

(খ) লোহার ব্যবহার শুরু হয় (চার হাজার বছর আগে/দুই হাজার বছর আগে/প্রায় তিন হাজার বছর আগে)।

(গ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(১) তামার সঙ্গে টিন মেশালে যে শক্ত ধাতু হয় তার নাম — ।

(২) নব প্রস্তর-যুগের ঠিক পরের যুগকে ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন — এবং — যুগ।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব-সভ্যতার আদিযুগ

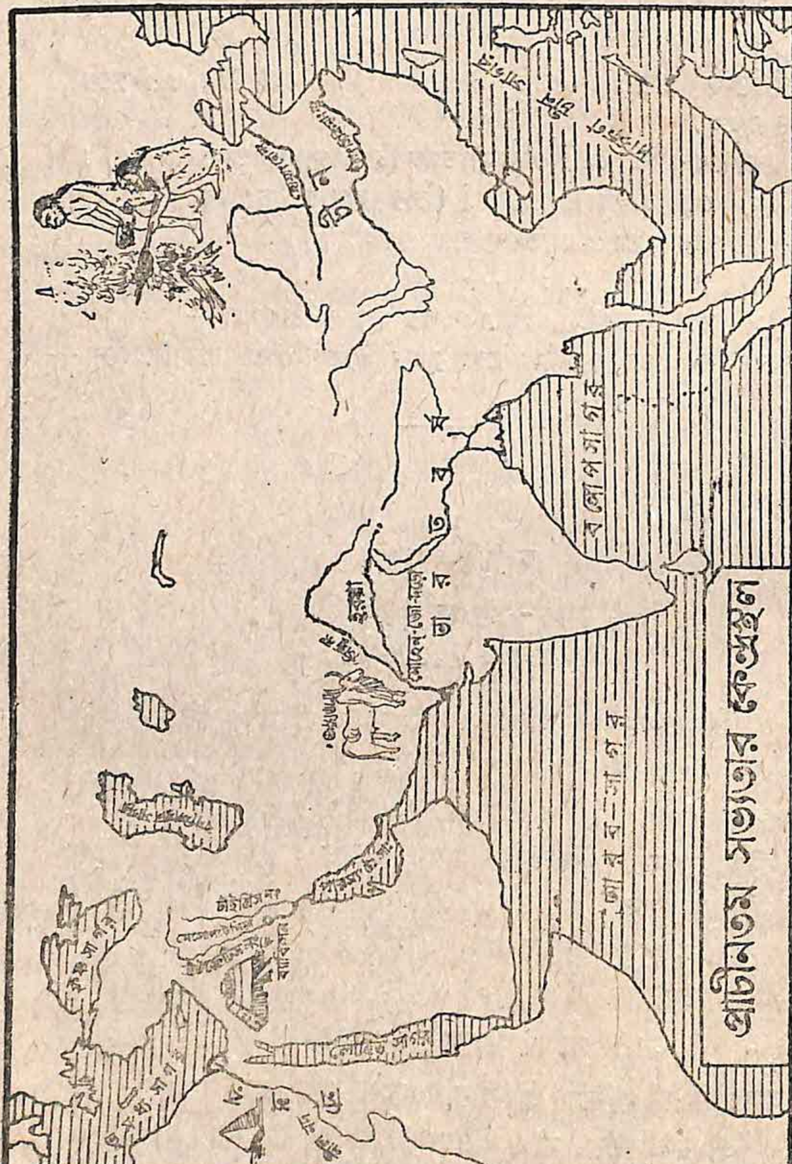
[খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০]

পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল চারটি নদীমাতৃক অঞ্চলে—পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়ায়, আফ্রিকার মিশর দেশে, ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে, এবং চীনদেশের হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর নিম্ন-উপত্যকায়। এদের মধ্যে মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের সভ্যতাই হলো প্রাচীনতম। এই কটি অঞ্চলের অধিবাসীরা কতদূর সভ্যতার পথে এগিয়েছিল, তা-ই আমরা একে একে আলোচনা করবো।

ক. মেসোপটেমিয়া

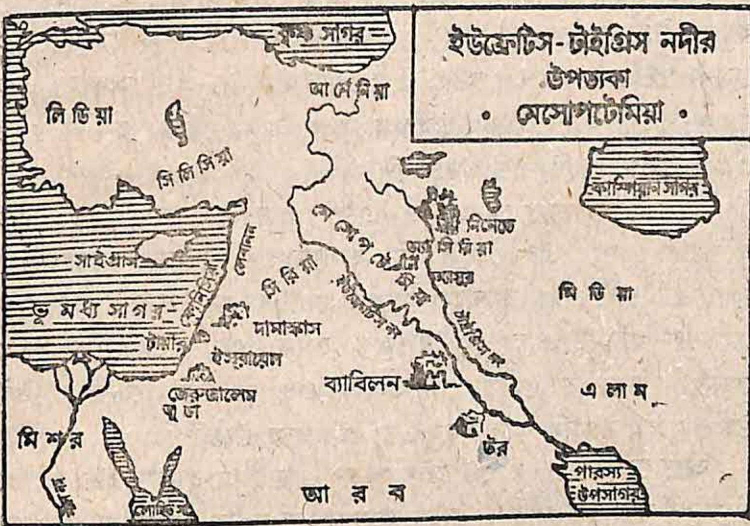
অবস্থান ঃ পশ্চিম এশিয়ায় আমরা দুটি বড় নদী দেখতে পাই। এদের একটির নাম ইউফ্রেটিস্, অপরটির নাম টাইগ্রিস। তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চলে এদের উৎস। নদী দুটি সেখান থেকে ক্রমে প্রায় সমান্তরালে বয়ে এসে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। এখন এদের মোহনা একটি ; কিন্তু প্রাচীনকালে ছিল ভিন্ন। এই নদী দুটির

মাঝখানের অঞ্চলের নামই হলো মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ নদী-ঘেরা



দেশ, নাম দিয়েছিলেন প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকেরা। এই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম মানব-সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

উর্বরতা এবং শস্যসম্ভার : মেসোপটেমিয়ার মাটি শস্য ফলাবার পক্ষে খুব উপযোগী। কিন্তু এর পশ্চিমে আরব দেশ ও তার উত্তরাঞ্চলের ধূ-ধূ মরুভূমি ; পূর্বে ইরাণ দেশের উঁচু মালভূমি। তাই



এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম ; খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়। মেসোপটেমিয়ার উর্বর ভূমিতে যব, গম, বার্লি প্রভৃতির চাষ হয়, এবং এখানে প্রচুর খেজুরও পাওয়া যায়।

দক্ষিণ অঞ্চলে প্লাবন রোধের ব্যবস্থা : মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশের নিম্নভাগ এক সময় সমুদ্রের জলের নীচে ছিল। ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর পলিমাটি পড়ে ক্রমে এই অঞ্চলটি উঁচু হয়ে ওঠে। তখন সেখানে অনেকগুলি আঁকাবাঁকা খাল, নালা, বিল এবং জলাজঙ্গল ছিল। জলে ছিলো অনেক রকমের মাছ, নলখাগড়া বনগুলিতে ছিল বহুরকমের পাখির সমাবেশ ; ডাঙায় চরে বেড়াতো বুনো শুয়োর, আর ছিল অনেক খেজুর গাছ। কিন্তু মাঝে মাঝে একটা মস্ত বড় বিপদ দেখা দিতো। তখন সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস এসে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। তাই আদি মেসোপটেমিয়াবাসীরা বড় বড় চওড়া খাল কেটে, বাঁধ বেঁধে এই মারাত্মক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস রোধ করবার ব্যবস্থা করে।

সুমেরীয়দের আগমন ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার উন্মেষ ঃ মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলটিকে যারা প্রথম বাসযোগ্য করে তুলেছিলো তারা এর নাম দেয় সুমের। তাই ইতিহাসে এরা সুমেরীয় নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা বোধ হয় হাজার সাতেক বছর আগে, উত্তরের কোনো এক পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে এসে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে, এবং একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলে এসে থামে। এর আগেই এরা চাষবাস এবং তামা দিয়ে হাতিয়ার ও অনেক রকম জিনিসপত্র গড়তে শিখেছিল।

কৃষি ও জলসেচ ঃ সুমেরে এসে এদের আরো কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হল। এরা দেখল যে, জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে খাল কেটে জমির উর্বরতা বাড়ানো যায়। তাতে শুধু ফসলই হয় না, ফসলের পরিমাণও অনেক বাড়ে। ক্রমে এরা এত বেশি ফসল পেতে লাগলো যে, খেয়েদেয়ে অঢেল বাড়তি থেকে যেতো। এই উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি করে ক্রমে এরা ধনী হয়ে উঠেছিল।

অন্যান্য বৃত্তি ঃ যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে সুমেরের নদী দুটির কোল ঘেঁষে জায়গায় জায়গায় অনেকগুলি শহর গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে প্রধান ছিল এরিডু, এরেক, ল্যাগাস্, নিপ্পুর ও উর প্রভৃতি নগর। তখন চাষবাস ছাড়াও শহরের লোকের নানারকম প্রয়োজন এবং শখ মেটাবার জন্য নতুন নতুন কাজকর্ম শুরু হলো। অনেক দালান-কোঠা তৈরি করবার কাজে লেগে গিয়ে হলো রাজমিস্ত্রী ; অনেকে কাঠের আসবাব-পত্র তৈরি করতে গিয়ে হলো ছুতোর মিস্ত্রী ; আবার কেউ হলো কাঁসারি, কেউ তাঁতি, কেউ পাথরকাটা মিস্ত্রী। এতে জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের কাজ পূর্বের চেয়েও বেড়ে গেলো। তখন একদল হল পুরোপুরি ব্যবসায়ী। চাষী এবং ব্যবসায়ীরা সুমেরের ধনসম্পদ্ উত্তরোত্তর বাড়াতে থাকে।

সুমেরবাসীর কয়েকটি বিশেষ অবদান

সু-উচ্চ অট্টালিকা ঃ যে অঞ্চলে সুমের রাজ্যটি গঠিত হয়েছিলো তার কাছাকাছি কোনো পাহাড়-পর্বত নেই। কাজেই সেখানে পাথর পাওয়া যায় না। গাছপালা থেকে যে কাঠ পাওয়া যেতো তাও ছিল বড় বড় বাড়িঘর তৈরি করবার পক্ষে অনুপযোগী। সুমেরবাসীরা যখন

ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো তখন তাদের মধ্যে বড় বড় ঘরবাড়ির চাহিদা দেখা দিয়েছিলো। তখন সমস্যা দাঁড়ালো এর মালমসলা কি করে যোগাড় করা যায়। সুমেরের কাদামাটির একটা বিশেষ গুণ আছে, এ দিয়ে রকমারি জিনিসপত্র তৈরি করা সহজ। তাই এদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এরা নদীর পাড়ের ঘন কাদামাটি ছাঁচে ঢেলে বড় বড় চওড়া টালির মত ইট তৈরি করলো— পৃথিবীর প্রথম ইট। তখন এখনকার মত আগুনে পুড়িয়ে পাকা ইট তৈরি করবার কৌশল জানা ছিল না। তাই সুমেরাবাসীরা রোদে শুকিয়ে ইটগুলি শক্ত করে নিতো। তারপর সেগুলিকে থাকে থাকে সাজিয়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করতে শুরু করে। প্রথমে ছোট ছোট একতলা বাড়ি, তারপর দোতলা তেতালা বাড়ি তৈরি করতে শিখেছিলো। ছাতের উপর থেকে পাইপের সাহায্যে জল নিকাশ এবং বাড়ির প্রাঙ্গণে কূপ খনন করে বাড়তি জল শুষে নেবার ব্যবস্থা এরাই প্রথম আবিষ্কার করে।

দেবমন্দিরঃ সুমেরবাসীদের সামাজিক জীবনের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল তাদের দেবমন্দির। তারা পৃথিবী (এনলিল), আকাশ (অনু), জল (এয়া), সূর্য (সামাস্), চন্দ্র (নানার) প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির পূজো করতো। এছাড়া প্রত্যেক শহরের আবার একজন করে বিশের আরাধ্য দেবতা থাকতেন। আরও অনেক প্রাচীন জাতির মতো সুমেরীয়রাও বিশ্বাস করতো যে, দেবতাদের চেহারা ও চরিত্র ছিল মানুষের মতো। তাই তাঁদেরও ঘরবাড়ি, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন হয়। দেবতাদের জন্য এই সকল জিনিসপত্রের পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল। এমনকি, তাদের জন্য শহরের বাইরে যব, গম ইত্যাদি শস্য উৎপাদনের জন্য পৃথক জমিজমা নির্দিষ্ট করে রাখা হতো।

সুমেরীয়রা তাদের আদি বাসভূমিতে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় উঠে দেব-দেবীর অর্চনা করতো। সুমেরের প্রত্যেকটি শহরের ঠিক মাঝখানে এরা থাকের উপরে থাক ইঁট সাজিয়ে কৃত্রিম পাহাড়ের সৃষ্টি করতো। এগুলি 'জিগ্‌গুরাট' নামে পরিচিত। এর ভিত্তি থাকতো বেশ প্রশস্ত, কিন্তু যতই উপরে উঠতো ততই থাকগুলির

পরিসর ছোট হতো। সকলের উপরের থাকে দেবমন্দির নির্মিত হতো। উর শহরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে উর-নম্মু নামে একজন রাজা একটি 'জিগ্‌গুরাট' নির্মাণ করেছিলেন, যার উচ্চতা ছিল ৬৮ ফুট। তার উপরে ছিল আরাধ্য দেবতার মন্দির। 'জিগ্‌গুরাটে'র চারদিকে থাকতো প্রাচীর-ঘেরা বড় বড় প্রাঙ্গণ। সেখানে গোলাভরা শস্য এবং কোঠায় কোঠায় নানারকম তৈজসপত্র, সোনারূপা, মণিমুক্তা জমিয়ে রাখা হতো। এছাড়া এই সকল মন্দির প্রাঙ্গণে টালির উপরে লেখা অনেক চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতিও পাওয়া গেছে। এথেকে তখনকার দিনের অনেক কথা জানা যায়।

সুমেরের ইতিহাসের আদিযুগে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, শহরের বিশেষ দেবতাই ছিলেন তাদের রাজা। পুরোহিতরা ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গণেই বাস করতেন। প্রধান পুরোহিতের অসীম ক্ষমতা ছিল। তিনি পূজা-অর্চনা ছাড়াও লোকজনের কাছ থেকে কর আদায় করতেন এবং ব্যবসা চালাতেন। এমন কি গরীবদের ঋণ দিয়ে সুদ আদায় করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না।

দেয়াল-চিত্র ঃ পৃথিবীর নানা স্থানে দেখা যায় যে, ধনিগৃহের সাজসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ দেয়াল-চিত্র। প্রাচীন মিশরে এরকম বহু চিত্র পাওয়া গেছে। সে সময়ে সুমেরেও যে এর প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি ধুয়ে-মুছে নষ্ট হয়ে গেছে। তার কারণ সেকালের বাড়িগুলি পাকা ইঁটের তৈরি না হওয়াতে পরবর্তীকালে ভেঙে-চুরে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

প্রস্তর-শিল্প ঃ সুমেরবাসীদের আরেকটি প্রধান অবদান হলো প্রস্তর-শিল্প। সুমেরে পাথর পাওয়া যেত না, সেকথা আগেই বলেছি। তাই বাইরে থেকে পাথর আমদানি করা হতো। সুমেরে পাথর দিয়ে সূক্ষ্ম কাজের জন্য একদল বিশেষ ধরনের শিল্পীর আবির্ভাব হয়। তারা কারুকার্যমণ্ডিত নানা আকারের এবং নানা রংয়ের পাথরের পাত্র তৈরি করতো, পাথরের ফলক খোদাই করে নানা ধরনের দৃশ্য আঁকতো; তাছাড়া পাথর দিয়ে তারা দেবতা ও রাজ-রাজড়াদের মূর্তি গড়তো।

ধাতুবিদ্যা ঃ সুমেরীয়রা সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ এবং আরো

নানারকম মিশ্র ধাতুর কাজেও বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। সেকালে ধাতুবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। প্রায় আদিযুগ থেকে সুমেরের রাজাদের মৃতদেহ শ্মশানে কবর দেওয়া হত না, প্রাসাদের প্রাঙ্গণে মাটির নিচে ইঁটের তৈরি কুঠরিতে তাঁদের প্রাণশূন্য দেহ সমাহিত করা হত। আর তার সাথে থাকতো তাঁদের সকল প্রিয়বস্তু। এদের একটি বিখ্যাত শহর ছিল 'উর'। উরের রাজাদের কবর খুঁড়ে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বহু অস্ত্রশস্ত্র, অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত সোনারূপার পাত্র, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণালঙ্কার, সোনার শিরস্ত্রাণ, রূপার বীণা প্রভৃতি বহু মূল্যবান জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল কাজ এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছিল যে আধুনিক যুগেও এদের কদর সমানই রয়ে গেছে।

যানবাহন : যানবাহনের ক্ষেত্রেও সুমেরীয়দের বিশেষ অবদান ছিলো। এরাই সর্বপ্রথম গরুতে টানা কাঠের তৈরি দু'চাকার গাড়ি তৈরি করেছিলো। এর কিছু পরে এরা গাধায় টানা রথের আবিষ্কার করে। কিন্তু তখনকার পথঘাট ভাল ছিল না, তাই স্থলপথে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবহার কম ছিল। সুমেরীয়রা নদীপথে যাতায়াত করাই বেশি পছন্দ করতো। এদের নৌকাগুলি নলখাগড়ার গোছা বেঁধে তৈরি হতো। ফাটল দিয়ে যাতে জল না ওঠে সেইজন্য নৌকার পাটাতন চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। জলপথে যাতায়াত সুগম হবার ফলে সুমেরের নদীর তীরে ছোট ছোট বসতিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। তখন বড় বড় শহর গড়ে তোলা সহজ হয়েছিলো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : নদীপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য শহরগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু পাথর, সোনা, রূপা, মণিমুক্তা এবং আরো অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস-পত্র সংগ্রহের জন্য সুমেরবাসীদের দূর দূর স্থানে যাতায়াত করতে হতো। ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের তীরের অধিবাসীদের সঙ্গে যে সুমেরবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চোর-ডাকাত এবং যাযাবর জাতিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবসায়ীরা একত্র হয়ে দল বেঁধে যাতায়াত করতো। টাকাকড়ির ব্যবহার

সেকালে ছিল না। এক জিনিসের বদলে আর এক জিনিস দিয়ে ব্যবসা চলতো। যারা ধনী ছিল, কেবলমাত্র তারাই সোনা-রূপা এবং মূল্যবান পাথর প্রভৃতি ব্যবহার করতো।

সুমেরীয় লিপি ঃ যতদূর জানা যায় সুমেরীয়রাই বোধ হয় সর্বপ্রথম লেখার আবিষ্কার করেছিলো। কাদামাটি দিয়ে তৈরি নরম টালির উপর এরা খাগের কলম এবং সরু কাঠের ফলা নিয়ে হাল্কাভাবে লিখতো। টালিগুলিকে পরে রোদে শুকিয়ে অথবা আগুনের তাপে শুকিয়ে শক্ত করে নেওয়া হতো। লেখাগুলি দেখাতো খোঁচা-



কিউনিফরম্ লিপি

খোঁচা, অনেকটা তীরের ফলার মতো। তাই সুমেরীয় লিপিকে বলা হয় **কিউনিফরম্** বা **কীলকাকৃতি লিপি**। এদের লেখা বহু হিসেব-পত্র, দলিল, চিঠিপত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব লেখা থেকে তখনকার দিনের অনেক খবরাখবর আমরা জানতে পারি।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৪০০০-৩০০০ সুমেরীয় সভ্যতার যুগ।

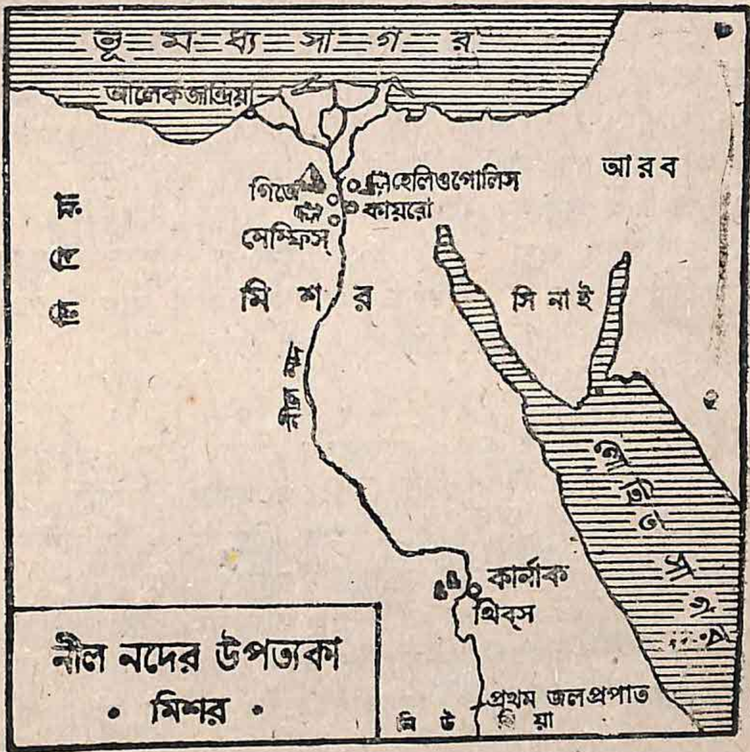
খ. মিশর

মিশরের অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাচীন যুগে মিশর বলতে বোঝাতো নীলনদের উপত্যকা আর তার আশপাশের অঞ্চল। দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণে সুদান• রাজ্য। আর দু দিকে সাহারা ও সিনাই উপদ্বীপের ধূ-ধূ মরুভূমি।

মিশরকে একটি মরুদ্যান বলা চলে। এর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদ, প্রায় সাতশ পঞ্চাশ মাইল লম্বা, দু পাশে রয়েছে শ্যামল শস্যক্ষেত্র; কোথাও দশ মাইল, কোথাও বা কুড়ি থেকে ত্রিশ মাইল চওড়া। মিশরের বাকি অংশ শুষ্ক বালি এবং কাঁকরে পরিপূর্ণ। মরুভূমি থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য মিশরীয়রা তাদের বাসভূমিকে বলত **কালোদেশ**।

মিশরের জলবায়ু খুব শুক্‌নো। বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। নীল নদ

যদি না থাকতো তাহলে মিশরও মরুভূমি হয়ে যেতো। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে নীল নদের তু-কূল পলিমাটিপূর্ণ বন্যার জলে ভেসে যায়।



নীল নদের উপত্যকা
• মিশর •

প্রাচীন কালে মিশরবাসীরা এই উর্বর পলিমিশ্রিত বন্যার জল খাল কেটে তাদের কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতো এবং সেগুলি শস্যপূর্ণ হয়ে উঠতো। নীল নদ মিশরের প্রধান সম্পদ্। এই নদীটির প্রভাব মিশরের মানুষ, জীবজন্তু, জমিজমা, গাছপালা প্রভৃতি সকলের উপরই সমান দেখা যায়। তাই হেরোডোটাস্ নামে একজন প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, মিশর হল **নীলনদের দান্**। মিশরবাসীরা একথা ভাল ভাবেই জানতো। তাই তারা নীল নদকে দেবতা বলে পূজা করতো। নীল নদের জল মাপবার জন্য তারা একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিলো। এ-থেকে বছরের ঠিক কোন্ সময়ে বন্যা আসবে তা পণ্ডিতরা বলে দিতে পারতেন। তাই বুঝে কৃষকরা শস্য বপন করতো।

ফেরো ঃ নব প্রস্তর-যুগে নীল নদের তীরে অনেক লোক ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতো। এরা পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য একত্র হতে থাকে। এইভাবে নীল নদের উপত্যকায়, উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি পৃথক্ রাজ্য গড়ে উঠেছিলো। এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে মেনেস্ নামে একজন দলপতি মিশরের উত্তর ও দক্ষিণের দুটি রাজ্যই তাঁর বশে আনেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০০)। তখন সমগ্র মিশর একটি অভিন্ন রাজ্যে পরিণত হয়। মেনেস্ যে বাড়িতে বাস করতেন মিশরীয়রা সেই বাড়ির নাম দিয়েছিল "পের-ও" অর্থাৎ বড়ো বাড়ি। ক্রমে "পের-ও" বলতে মিশরের রাজাকেই বোঝাতো। ইহুদিরা এই নামটিকে 'ফেরো' বলে উচ্চারণ করতো। এই উপাধিতেই মিশরের রাজারা এখনও পরিচিত।

ফেরোরা দাবি করতেন যে, তাঁরা হলেন দেবতা, শুধুমাত্র দেবতাদের প্রতিনিধি নন। দেবলোক থেকে তাঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সকল শ্রেণীর মিশরবাসী তাঁদের এই দাবি মেনে নিয়েছিল। ফেরোর অধিকার ও ক্ষমতা ছিল অবাধ ও অসীম। মিশরীয়দের দেহ ও মন তাঁর কাজে নিয়োজিত থাকতো; তাদের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শুধু তাই নয়, ফেরো ছিলেন মিশরের সমস্ত জমিজমা ও ধন-সম্পত্তির একমাত্র মালিক। এমন কি তিনি ছাড়া অন্য কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে পারতো না। তাঁর ইচ্ছায় দেশের শাসন ও বিচার চলতো। তাঁর মুখের কথাই ছিল আইন। কেউ যদি তাঁকে অমান্য করতো, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, তার একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যু।

পুরোহিত-শ্রেণী ঃ মিশরের পুরোহিতরাই ছিলেন ফেরোর প্রধান সহায়। ফেরোকে দেবতা বলে প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা অনেক গল্প ও উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছিলেন। সাধারণ লোকেরা এই সকল গল্প সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো। তাই ফেরো সব সময় পুরোহিতদের খাতির করে চলতেন। যাঁরা তা করতেন না, তাঁদের অনেক দুঃখ-দুর্দশায় পড়তে হতো।

ফেরোরা দেবতাদের পূজা-অর্চনার জন্য অনেক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করতেন। এর খরচপত্র চালাবার জন্য জমিজমা, গবাদি পশু প্রভৃতি

বরাদ্দ থাকতো। তাঁরা দেবতাদের সাজসজ্জার জন্য সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা প্রভৃতিও দান করতেন। কার্যতঃ পুরোহিতরাই এইসব ভোগ করতেন। তাঁরা ক্রমে ধনী হয়ে উঠলো।

প্রথমদিকে পুরোহিতরা ছাড়া কেউ লেখা-পড়া করতো না। তাই দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি তৈরি করতে, হিসাবপত্র রাখতে তাঁরা ফেরোকে সাহায্য করতেন। সাধারণ লোকেরাও এটা-ওটা জানতে পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতো। তাই সমাজে মিশরের পুরোহিতদের যথেষ্ট মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

মিশরীয় লিপি ও লেখকঃ সুমেরীয়দের প্রায় পিঠাপিঠি মিশরীয়রাও একরকম লেখার আবিষ্কার করেছিল। পিরামিড ও মন্দিরের দেওয়াল, পাথরের চৌকা স্তম্ভ এবং প্যাপিরাস্ নামক এক রকম উদ্ভিদের তৈরি পাটির উপর মিশরীয়দের অনেক লেখা পাওয়া গেছে। অক্ষরের বদলে মানুষ, পশুপাখি, এবং আরো অনেক রকম সাংকেতিক চিহ্নের ছবি দিয়ে লেখা বলে এগুলিকে **হাইরোগ্লিফিক্** বা **চিত্রলিপি** বলা হয়।

মিশরীয় লিপি লিখতে দীর্ঘ সময় লাগতো এবং এতে যথেষ্ট পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হতো। পুরোহিতরা কিন্তু কাউকে এই লেখা শেখাতে সহজে রাজী হননি। তাঁদের ভয় ছিল যে, অন্যলোকে লিখতে শিখলে তাঁদের লাভের বখ্‌রা কমে যাবে। এ-দিকে রাজ-দরবারে লেখা-পড়ার কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পুরোহিতরা তা শেষ করে উঠতে পারতেন না। তাই আরো অনেক লিখতে-জানা লোকের প্রয়োজন হয়। রাজদরবারে যারা কাজকর্ম করতো তারা সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতো, তাই অনেক লোক লেখা শেখবার জন্য এগিয়ে আসে। এইভাবে প্রাচীন মিশরে 'লেখক' নামে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল।



হাইরোগ্লিফিক

এখন লেখবার জন্য যে সকল জিনিসপত্র আমরা ব্যবহার করি তার অনেকগুলি মিশরীয়রা আবিষ্কার করেছিলো। জলাভূমিতে হোগ্‌লার মত দেখতে 'প্যাপিরাস' নামক একরকম লম্বা উদ্ভিদ্ জন্মাতো। মিশরীয়রা এর তেকোণা ডাঁটা পাতলা সরু করে কেটে একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে লম্বা পাটির মত তৈরি করতো এবং তার উপর লিখতো। এই 'প্যাপিরাস্' শব্দটি থেকে ইংরেজী 'পেপার' শব্দটি তৈরি হয়েছে। লেখবার জন্য মিশরীয়রা খাগের কলম ব্যবহার করতো, জলে আঠা ও রং মিশিয়ে তৈরি করতো কালি।

কর-সংগ্রাহক : ফেরো যে সব খরচপত্র করতেন তার বেশির ভাগই যোগাড় হতো চাষীদের কাছ থেকে। আমরা আগেই দেখেছি, মিশরের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফেরো, কর হিসাবে চাষীরা তাঁকে দিতো উৎপন্ন শস্যের একটা মোটা ভাগ এবং গরুবাছুর, মদ প্রভৃতি। যারা কর আদায় করতো তাদের মধ্যে প্রচুর দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে তারা নানা উপায়ে 'উপরি' আদায় করতো। কৃষকদের সাধ্য ছিল না তারা এর প্রতিবাদ করে। যদি কেউ প্রতিবাদ করতো তা হলে তার ক্ষেতে খালের জল যাবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হতো। কৃষকরা কর-আদায়কারীদের মনে মনে অভিসম্পাত করতো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই,—প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না।

শ্রমজীবীদের দল : ফেরো এবং পুরোহিতদের কিরূপ মান-মর্যাদা ছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। এঁদের বাদ দিলে যাঁরা থাকেন তাঁরা হলেন ফেরোর পুত্র-কন্যা, রাজকর্মচারী, শিল্পী, কৃষক ইত্যাদি। রাজপরিবারের লোকজন এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়ে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সকলেই ছিল অধমশ্রেণীর লোক ও ফেরোর গোলাম। কৃষকেরা শুধু কৃষিকার্যই করতো না, খালকাটা, বাঁধবাঁধাও ছিলো তাদের দায়িত্ব। শিল্পীদের কোনো নিজস্ব কর্মস্থল ছিল না। তারা ফেরোর কারখানায় কাজ করতো ; তিনিই ছিলেন তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক। যারা যুদ্ধে বন্দী হতো তারা কেনা গোলামের মতো কাজ করতো। পিরামিড ও মন্দির নির্মাণ এবং জাহাজের দাঁড় বাওয়া প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজে এদের লাগানো হতো। যুদ্ধের

সময় নিম্নশ্রেণীর সকল লোকই সৈনিকের কাজ করতো। শ্রমজীবীদের শুধু বেঁচে থাকবার অধিকার ছিল। কায়ক্লেশে তাদের জীবন কাটতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ফেরোর এক-চেটিয়া। এইজন্য তখন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের নিয়ে কোনো মধ্যমশ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি। মিশরের ভিতরে যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া যেতো, কর হিসাবে সে সব 'বড়ো বাড়ি'র কোষাগারে জমা হতো। ফেরোর লোকজন গাধায় চড়ে সুদানে যেতো; সেখানকার কালো মানুষদের কাছ থেকে তারা আবলুস কাঠ, হাতির দাঁত, উটপাখির পাখনা, চিতাবাঘের ছাল, নানা-রকম সুগন্ধি আঠা এবং সোনা কিনে আনতো। সিনাই অঞ্চল থেকে আসতো তামা। ইজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলের বন্দর এবং আরব দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ফেরোরা একশ' ফুট, কি তারও বেশি লম্বা জাহাজ তৈরি করাতেন। এই সকল স্থান থেকে আসতো ভারি ভারি দামী কাঠ, পূজা-অর্চনার জন্য সুগন্ধি ধূপ-ধূনা, নানারকম তেল, রূপা আর চুনী-পান্না প্রভৃতি দামী পাথর। ফেরোদের বিলাস-ব্যসনের যোগান দিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ফলে ধন-ঐশ্বর্যে মিশর হয়ে উঠেছিল সে যুগের সকলের সেরা।



ম্যমি

পিরামিড ঃ মিশরীয়রা মনে করতো, মৃত্যুর পরও মানুষের আত্মা মৃতদেহের মধ্যেই বাস করে। তাই মৃতদেহগুলিকে রক্ষা করবার জন্য মিশরবাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা করতো। মৃতদেহগুলিকে কিছুদিন নোনা জলে ডুবিয়ে

রেখে তার গায়ে নানারকম মসলা মাখানো হতো। তারপর আঠা-মাখানো কাপড়ের ফালি দিয়ে সেগুলিকে জড়ানো হতো। হাওয়া-বাতাস লেগে মৃতদেহগুলি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য সেগুলিকে একটি পাথরের তৈরি বাক্সের ভিতরে রেখে কবর দেওয়া হতো। বাক্সের ঢাকনাগুলি দেখতে হতো মৃত ব্যক্তির চেহারার মতো। মৃতদেহগুলিকে বলা হত ম্যমি। পৃথিবীর বহু জাদুঘরে এই ম্যমিগুলি এখনো দেখা যায়।

আত্মার ব্যবহারের জন্য কবরের কাছেই একটি কোঠা তৈরি করে নানা রকম খাবার-দাবার দেওয়া হতো। যেসব জিনিস মৃত-ব্যক্তি ব্যবহার করতো সেগুলিও রাখা হতো। তুতেন-খামেন নামে একজন ফেরোর কবরের মধ্যে সোনা-রূপার থালা-ঘটি-বাটি, অপূর্ব কারুকার্যখচিত চেয়ার-টেবিল-পালঙ্ক, গান-বাজনার সাজসরঞ্জাম, রাজপোশাক, সোনা-রূপার পাতে মোড়া রথ প্রভৃতি বহু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।

আদি যুগের ফেরোদের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের মৃতদেহগুলি রক্ষা করবার জন্য নিজেরাই বড় বড় সমাধিগৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এগুলিই হলো মিশরের বিখ্যাত পিরামিড। চারকোণা ভিতের উপর বড় বড় পাথর থাকে থাকে গেঁথে এগুলি তৈরি করা হতো।



পিরামিড

উপরের অংশ ক্রমে সরু করে গাঁথা হতো। তাই যে-কোনো পাশ দিয়ে দেখলে এগুলি ত্রিভুজের মত দেখায়। কায়রো থেকে কিছু দূরে তিনটি বড় বড় পিরামিড আছে। যেটি সবচেয়ে বড় সেটি তেরো একর জমির উপর অবস্থিত। এটি প্রায় পাঁচশ' ফুট উঁচু, তৈরি করতে কুড়ি লক্ষেরও বেশি পাথরের বড় বড় ইট লেগেছিল। প্রত্যেকটি ইটের ওজন ছিল আড়াই টন। এক লক্ষেরও

বেশি লোক কুড়ি বছর ধরে এটি নির্মাণ করে। পরবর্তীকালের ফেরোরা তাঁদের রাজধানীর অনতিদূরে পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার গভীর অভ্যন্তরে মৃতদেহ সমাহিত করবার ব্যবস্থা করতেন।

মিশরীয়দের ধর্ম-বিশ্বাস ঃ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ নানাদেশ ভ্রমণ করে বলেছিলেন যে, প্রাচীন মিশরীয়দের মতো ধর্মপ্রাণ মানুষ তিনি আর কোথাও দেখেন নি। মিশরীয়দের জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল পূজা-পার্বণ। সেকালের মিশরবাসীরা বহু দেব-দেবীর পূজা করতো। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্য দেবতা **রা,** থিবস্ নগরের **আমন,** পরলোকের দেবতা **ওসাইরিস্** ও তাঁর পত্নী **আইসিস্** এবং **নীল নদ**। এছাড়া শকুনি, শেয়াল, বিড়াল, ভেড়া, কুমীর প্রভৃতি জীবজন্তুকেও মিশরীয়রা পূজা করতো। কারণ



মিশরের দেবদেবী

অশিক্ষিত সাধারণ মিশরবাসীরা মনে করতো যে, এইসব জীব-জন্তুই ছিল তাদের আদি পুরুষ।

'আমনে'র উদ্দেশ্যে মিশরীয়রা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরি করেছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর মন্দিরটি 'কারনাকের মন্দির' নামে পরিচিত। এই মন্দিরের স্তম্ভগুলির গড়ন এবং কারুকার্য দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। পিরামিড এবং

দেবমন্দিরগুলির নির্মাণকৌশল দেখলে বোঝা যায় যে, গৃহ-নির্মাণে সে যুগের মিশরবাসীরা কত উন্নতি করেছিল।

জীবনধারণের বৃত্তিঃ প্রাচীন যুগে মিশরের মানুষ কি কি কাজ করতো তার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় পিরামিডগুলির দেওয়াল-চিত্র থেকে। আমরা কোথাও দেখি, কৃষকরা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করছে। আঙ্গুর পিষে মদ তৈরি করছে, জেলেরা মাছ ধরছে, কুম্ভকাররা সুন্দর সুন্দর রং-বেরঙের পাত্র তৈরি করছে; তাঁতিরা সূক্ষ্ম সুতা কেটে তাঁতের কাপড় বুনছে। স্বর্ণকাররা মণিমুক্তো-খচিত অলঙ্কার গড়ছে। আসবাব-নির্মাতারা স্বর্ণরৌপ্য-খচিত চেয়ার, টেবিল, পালঙ্ক তৈরি করছে, বাদ্যকররা বাঁশী, বীণা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র বাজাচ্ছে। আবার কোথাও দেখি, যাদুকররা তাদের যাদুবিদ্যার খেল্ দেখিয়ে লোকের মন কেড়ে নিচ্ছে। মিশরীয় শিল্পীরা নানা-রকম কাচের জিনিসপত্র তৈরি করতো। তারাই সর্বপ্রথম কাচের আবিষ্কার করেছিল। রঙীন কাচের ব্যবহারও তারা জানতো। চিত্রকররা কি রকম উন্নতি করেছিল তার জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় পিরামিডগুলির দেওয়ালে। যারা ভাস্করশিল্পের কাজ করতো তারাও কিছু কম যেতো না, তাদের তৈরি বিরাট বিরাট মূর্তি এবং মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই-করা চিত্র আজও আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সে যুগে মিশরীয় শিল্পীদের কোনো তুলনা ছিল না। তখন অন্য দেশের লোক তাদের তৈরি জিনিসপত্র আগ্রহ করে কিনতো।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব ৩৪০০ প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।

" " ২৯০০-২৭৫০ পিরামিডের যুগ।

গ. *সিন্ধুতীরের সভ্যতা*

সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার-কাহিনীঃ মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো সেকালে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের তীরেও একটি উন্নত ধরনের সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। সিন্ধু-প্রদেশের **মোহেঞ্জো-দড়ো** ও পশ্চিম পাঞ্জাবের **হরপ্পায়** এই সভ্যতার নিদর্শনগুলি বেশি পাওয়া

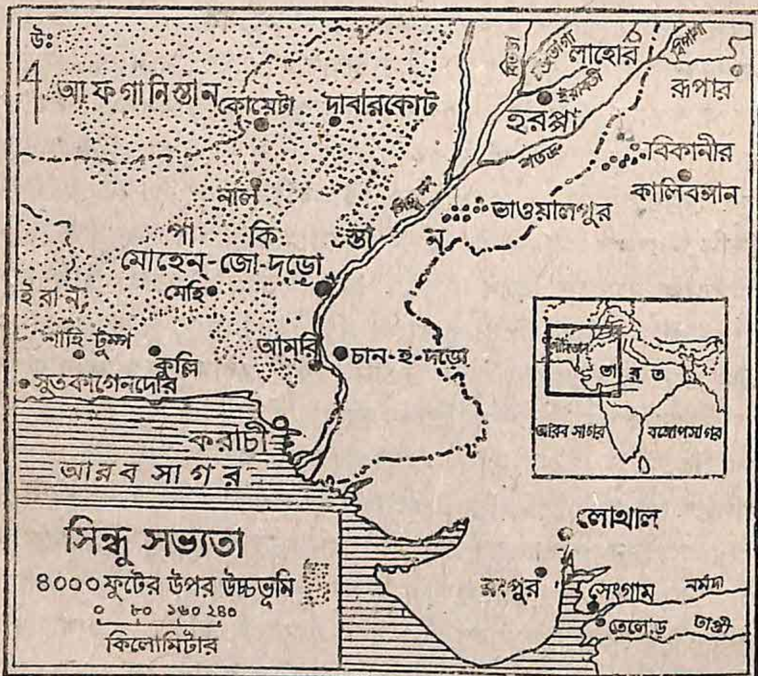
গেছে। এখন এই দুটি জায়গাই পাকিস্তানের মধ্যে। অনেকে সিন্ধুতীরের সভ্যতাকে "মোহেঞ্জো-দড়ো সভ্যতা" বলে আখ্যা দেন। সিন্ধীভাষায় 'মোহেঞ্জো-দড়ো' নামটির অর্থ হল "মৃতের স্তূপ"। ষাট বছর আগে এখানে জনমানবের কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। স্থানটি ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ; তার মাঝে লুকিয়ে ছিল বড় বড় ধ্বংসস্তূপের ঢিপি

সিন্ধুতীরের সভ্যতার আবিষ্কার-কাহিনী অতি চিত্তাকর্ষক। আমাদের বাংলাদেশেরই একজন ঐতিহাসিক এই সুপ্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০ খ্রীঃ)। পুরানো জিনিসপত্রের সন্ধানে রাখালদাস ক্রমাগত পাঁচ বছর ধরে দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একদিন একটা হরিণ শিকার করতে গিয়ে তিনি জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি মোহেঞ্জো-দড়োতে এসে হাজির হন। স্থানটি দেখেই তাঁর মনে হলো যে, এখানে কিছু পুরোনো জিনিস মিলতে পারে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে এখানে ফিরে এসে তিনি একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তখন তিনি কল্পনা করতে পারেননি যে, এই স্তূপটির নীচ থেকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। তিনি স্থির করলেন যে, স্তূপটির সকল অংশ খুঁড়ে বার করবেন। সকলের নীচের অংশ খুঁড়তে খুঁড়তে তিনি অজানা অক্ষরে খোদাই-করা কতকগুলি শীলমোহর পেয়ে যান। এর আগে এই একই রকম শীলমোহর হরপ্পায়ও পাওয়া গিয়েছিল। রাখালদাস তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলেন যে, মোহেঞ্জো-দড়ো এবং হরপ্পার মধ্যে এক সময় নিশ্চয়ই কোনো যোগাযোগ ছিল। তিনি আরও বলেন যে, এই সকল শীলমোহর চার-পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। সেদিন পণ্ডিতরা বোধহয় তাঁর কথা শুনে হেসেছিলেন।

রাখালদাসের অনুমান যে মিথ্যে নয় দু-তিন বছরের মধ্যেই তা প্রমাণ হলো। আরো কয়েকজন পণ্ডিত লোক মোহেঞ্জো-দড়োর মাটি খুঁড়ে কয়েকটি বড় বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, কিছু মূল্যবান অলংকার এবং কয়েকটি ছোট-ছোট সুন্দর জিনিসপত্র আবিষ্কার করেন। এইসব দেখেশুনে দেশবিদেশের পণ্ডিতরা বললেন যে,

এখানে একদল অবস্থাপন্ন লোক বাস করতেন, এবং তাঁরা ছিলেন প্রাচীন সুমেরীয়দের সমসাময়িক।

তখন স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি মোহেঞ্জো-দড়োর উপর পড়লো। আরো বেশি খোঁড়াখুঁড়ির জন্য ভারত সরকার প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করলেন। স্যার জন মার্শাল নামে একজন পণ্ডিতের নেতৃত্বে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চললো। এর ফলে বহু ঘরবাড়ি, কুয়ো, ড্রেন,



স্নানাগার, পায়খানা, রাস্তা এবং অসংখ্য পুরোনো জিনিস আবিষ্কৃত হলো। তখন বোঝা গেল যে মোহেঞ্জো-দড়ো ছিল সে যুগের একটি বড় শহর।

ইতিমধ্যে হরপ্পাতেও পুরোদমে খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। এখানে মোহেঞ্জো-দড়োরই মতো একই রকম জিনিস পাওয়া যায়। তখন এত উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের আরও বহুস্থান এবং পাশাপাশি অঞ্চলের স্তূপগুলিও খুঁড়ে দেখবার ব্যবস্থা হয়। এতে ক্রমে দেখা যায় যে, ভারতের এই প্রাচীনতম সভ্যতা পাঞ্জাবের শিবালিক পর্বতের পাদদেশ থেকে মহারাষ্ট্রের কিম্ নদী

এবং বালুচিস্তানের পূর্বাঞ্চল থেকে গঙ্গাযমুনার উপকূল পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। মোহেঞ্জো-দড়ো এবং হরপ্পাই ছিল এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। এই শহরদুটি ছিল প্রাচীন সিন্ধুতীরবাসীদের রাজধানী।

মোহেঞ্জো-দড়ো এবং হরপ্পায় যে সকল শীলমোহর পাওয়া গেছে তার উপর অনেক কিছুই লেখা আছে। অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত কেউ সে সব লেখা সন্তোষজনক ভাবে পড়তে পারে নি। তাই সে যুগে সিন্ধুনদের তীরে কোন্ জাতের লোক বাস করতো, কারা শাসনকার্য চালাতো তা আমরা জানতে পারিনি। তবে এদের ঘর-বাড়ি এবং জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে তা থেকে এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।



সিন্ধু উপত্যকার শীলমোহর

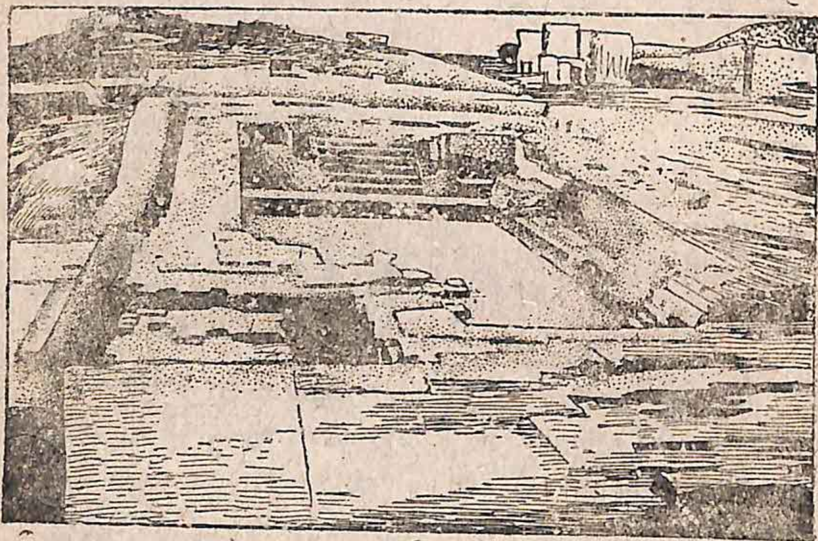
নগর-পরিকল্পনা ঃ মিশর ও মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের মতো সে যুগের সিন্ধুতীরের অধিবাসীরাও শহরে বাস করতো। নগর নির্মাণে তারা যে রকম দক্ষতা দেখিয়েছিল তা খুবই বিস্ময়কর। বোধহয় কোনো সুদক্ষ শিল্পী শহরবাসীর স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে নগরগুলির পরিকল্পনা করতেন। তখনকার দিনে পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না।

মোহেঞ্জো-দড়ো শহরটি ছিল আয়তনে বেশ বড়ো। সেখানে অনেকগুলি ছোট-বড়ো রাস্তা দেখা যায়। এগুলি ছিল সোজা ও লম্বা এবং বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি পরিষ্কার রাখবার জন্য পাশে পাশে আবর্জনা ফেলবার পাত্র রাখা হতো। জল নিকাশের জন্য ছিল ঢাকা-দেওয়া ড্রেন। সাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্তার পাশে পাশে মাঝে মাঝে কুয়ো ছিল। তাছাড়া রাস্তায় আলো দেবারও বোধহয় ব্যবস্থা ছিল।

শহরের বাড়িগুলি ছিল পাকা ইটের তৈরি। এই ইটগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হতো। এর মধ্যে কতকগুলি বাড়ি ছিল দোতলা বা তেতলা। অধিকাংশ বাড়িতে স্নানের ঘর, পায়খানা ও

জল-নিকাশের সু-বন্দোবস্ত ছিল। বাড়ির নর্দমাগুলিকে রাস্তার বড়ো ড্রেনের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হতো।

মোহেঞ্জো-দড়োতে যে সকল বাড়িঘর পাওয়া গেছে তার ভিতর একটি খুব বড়ো স্নানাগার ছিল। এটি লম্বায় ছিল ৩৯ ফুট, ২৩ ফুট



মোহেঞ্জো-দড়োর স্নানাগার

চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। এটি ছিল একটি আশ্চর্য জিনিস। নিকটের একটি সরোবর থেকে কৃত্রিম উপায়ে জল এনে একে পরিপূর্ণ করা হতো। আবার ময়লা জল বের করে দেবারও ব্যবস্থা ছিল। সম্ভবত জলের মধ্যে খেলধুলা ও স্নান করবার জন্য বহু লোক সেখানে জমা হতো।

মোহেঞ্জো-দড়োতে অনেকগুলি থামওয়ালা এককক্ষ-বিশিষ্ট একটি বাড়িও দেখা যায়। এর ভিতরে সারি সারি বসবার আসন আছে। হরপ্পাতেও এই রকমই লম্বা-চওড়া একটি কক্ষ পাওয়া গেছে। শহরের যাঁরা শাসক ছিলেন সম্ভবত তাঁরা এখানে এসে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য মিলিত হতেন। যিনি শাসকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তিনি শহরের দুর্গের ভিতর বাস করতেন। কর হিসেবে যে সকল শস্য পাওয়া যেতো সেগুলি জমিয়ে রাখার জন্য শহরেই একটি করে খুব বড়ো শস্যাগার ছিল।

খাদ্য ও বেশভূষা ঃ সিন্ধুতীরের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এখানকার উর্বর জমিতে যব, গম, ধান ও তুলার চাষ হতো। যব, গম ও ধানের তৈরি খাবার ছাড়াও এরা তরমুজ, খেজুর প্রভৃতি ফলও খেতো। এদের গরু, মোষ, শূয়োর, ভেড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি নানা রকম গৃহপালিত জীবজন্তু ছিল। এই সকল জীবজন্তুর মাংস এবং মাছ, কচ্ছপ প্রভৃতিও তারা খেতো।

সে যুগের সিন্ধুতীরবাসী লোকেরা তুলা ও পশমের তৈরি পোশাক পরতো। তুলার আঁশ থেকে কাপড় তৈরি করবার কৌশল এরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল। সুতা কাটার অসংখ্য টেকোও এখানে পাওয়া গেছে। পুরুষেরা দাড়ি রাখতো কিন্তু গোঁফ কামিয়ে ফেলতো। মাথার চুল থাকতো লম্বা; চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিতো এবং তা সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত ঘোরানো একটি ফিতা দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। স্ত্রীলোকেরা এখনকার মতই বেণী করে চুল বাঁধতো। তাদের প্রসাধন-দ্রব্যের মধ্যে ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি আয়না, হাতির দাঁতের চিরুনি, এক রকম সাদা গুঁড়ো (পাউডার) আর তিলক কাটার জন্য সিঁদুরের মতো একরকম জিনিস। স্ত্রীপুরুষ সকলেই গহনা পরতে ভালবাসতো।

শিল্পকলা ঃ সিন্ধু-উপত্যকায় তখন যারা বসবাস করতো, তাদের খুব রুচিবোধ ছিল। তাই কারুশিল্প সে-যুগে খুব উন্নতিলাভ করেছিল। শিল্পীরা নানাধরনের বাসন-কোসন, অলংকার, আসবাব-পত্র এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করতো। আগুনে পুড়িয়ে ইট তৈরি করতে এরা যেমন দক্ষ ছিল. সুমার ও মিশরের লোক সেরকম ছিল না। এদের তৈরি মাটির পাত্রগুলি ছিল যেমনি মসৃণ তেমনি চকচকে। অনেকে এগুলির উপর নানা রকম ছবি এঁকে মনোহারী করে তুলতো। মাটির পাত্র তৈরি করবার জন্য এরা কুমোরের চাক ব্যবহার করতো।

এখনকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মতো সেকালের ছেলে-মেয়েরাও মাটির খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসতো। সিন্ধু-উপত্যকায় সেকালের বহু খেলনা পাওয়া গেছে, যেমন—মাটিতে গড়া ছোট-ছোট মানুষ, গরু, ভেড়া, হাতি, মোষ, শূয়োর, বাঁদর, মুরগী প্রভৃতি।

এর কতকগুলি এমন ভাবে তৈরি হতো যে তারা মাথা নাড়তে পারতো। এছাড়া আরও পাওয়া গেছে মাটির ঠেলাগাড়ি এবং



মোহেঞ্জো-দড়োর মাটির পাত্র ও নর্তকী মূর্তি

চেয়ার প্রভৃতি ছোট-ছোট আসবাবপত্র। তাই সে যুগে ছোটদের খেলনার কোনো অভাব ছিল না।

ধাতুর ব্যবহারেও সে যুগের শিল্পীরা কম নিপুণ ছিল না। ধাতুর তৈরি এমন সব বাসন-কোসন পাওয়া গেছে যা এখনো গৃহস্থের ঘরে বেমানান বলে মনে হবে না। আমরা আগেই দেখেছি যে, সেকালের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গহনা পরতে ভালবাসতো। গহনাগুলি তৈরি হতো সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ এবং হাতির দাঁত দিয়ে। এগুলির মধ্যে দেখা যায় দামী পাথর-বসানো জড়োয়া হার, হাতে পরার বালা, কানে পাশা, আংটি, কোমরবন্ধ প্রভৃতি। যোদ্ধারা খড়্গ, কুঠার, বর্শা প্রভৃতি ব্যবহার করতো। ব্রোঞ্জের তৈরি আয়না, খুর, সূচ, বঁড়শি প্রভৃতি তৈরি হতো গৃহস্থদের জন্য। সেকালে পৃথিবীর কোনো জায়গায়ই লোহার ব্যবহার জানা ছিল না।

মাটির পাত্র ও শীলমোহরগুলির উপর যেসব ছবি দেখা যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, এদের মধ্যে অনেক নিপুণ চিত্রকর ছিল। সেকালের ভাস্কররা সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়তে পারতো। ব্রোঞ্জের নির্মিত এমন একটি নর্তকী-মূর্তি পাওয়া গেছে যা দেখে অনেক সমঝদার পণ্ডিত মুগ্ধ হয়েছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ কাঁচামাল যোগাড় করতে না পারলে কোনো দেশেই শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। সব কাঁচামালই দেশের মাটিতে জন্মায় না। তাই সেগুলি আমদানি করতে হয়। আবার প্রচুর চাহিদা না থাকলে শিল্পের উন্নতি হয় না। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও চাহিদা থাকা দরকার। সুমার ও মিশরের বেলা আমরা তাই দেখেছি। সেকালে দেশে-বিদেশে সিন্ধুতীরের লোকদের তৈরি জিনিসপত্রেরও যথেষ্ট চাহিদা ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করে এই চাহিদা মেটানো হতো। সিন্ধুতীরবাসীরা দেবদারু গাছের কাঠ যোগাড় করতো হিমালয় থেকে ; কাশ্মীর থেকে আসতো হরিণের শিং ; এরা রাজপুতানা এবং বালুচিস্থান থেকে আনতো তামা আর আফগানিস্তান থেকে সীসা। সোনা আনা হতো দাক্ষিণাত্য থেকে। টিন এবং নানারকম মূল্যবান পাথর যোগাড় করার জন্য এদের যেতে হতো বিদেশে। এইভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাইরে এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার লোকজনদের সঙ্গে এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। সিন্ধুপারে তৈরি নানা জিনিস ইউফ্রেটিস্-টাইগ্রিস্ তীরের লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে কিনতো। আবার মেসোপটেমিয়ার তৈরি জিনিসও মোহেঞ্জো-দড়ো-হরপ্পার লোক খুবই পছন্দ করতো। সে যুগের বণিকরা স্থলপথ ও জলপথ, উভয় পথেই ব্যবসা করত। স্থলপথে এখনকার মতো গরুর গাড়িতে অথবা পায়ে হেঁটে যেতে হতো। সিন্ধু-উপত্যকার দেশী-বিদেশী জিনিসপত্র দেখে একজন মহাপণ্ডিত বলেছেন যে, আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পাই সিন্ধু-উপত্যকার শহর-গুলিতে অনবরত ব্যবসায়ী-বণিকেরা আসছে আর যাচ্ছে।

পূজা-অর্চনা ঃ প্রাচীন সিন্ধুতীরবাসীদের পূজা-অর্চনা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই। কারণ মাটি খুঁড়ে এদের কোনো মন্দির, পূজার বেদী, দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই অনেক কিছুই অনুমান করে নিতে হয়। প্রাচীন যুগে পশ্চিম এশিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশে একরকম নারীমূর্তি গড়ে জগন্মাতার পূজা করা হতো। ঠিক এইরকম মূর্তি সিন্ধু-উপত্যকায়ও পাওয়া গেছে। তাছাড়া এখনও হিন্দুরা যেমন শিবলিঙ্গ গড়ে পূজা করে

সেইরকম দেখতে অনেকগুলি মূর্তি সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি শীলমোহর পাওয়া গেছে যার উপর দেখা যায় একজন ত্রিমুখবিশিষ্ট পুরুষ যোগাসনে বসে আছেন আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে নানারকম জীবজন্তু। অনেকে বলেন এটি হলো পশুপতি মূর্তি। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, শিবের আর এক নাম পশুপতি। এইসব মূর্তি ও চিত্র দেখে মনে হয় যে, এরা শিব ও জগন্মাতার পূজা করতো। তাছাড়া এরা বোধ হয় ষাঁড়, কুমির, সাপ প্রভৃতি জন্তু এবং কতকগুলি গাছকে পবিত্র বলে ভাবতো। যদি এই সকল অনুমান সত্যি হয় তাহলে বলতেই হবে যে হিন্দুরা শিব, জগন্মাতা এবং নানারকম উপদেবতার পূজা-পদ্ধতি এদের কাছ থেকে পেয়েছিল।



পশুপতি মূর্তি

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ঃ সে যুগে সিন্ধুতীরে নানা জাতির লোক বাস করতো। তাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র দুই শ্রেণীর লোকই ছিল। মোহেঞ্জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল দোতলা-তেতলা বাড়ি ছিল, যেখানে আলাদা স্নানের জায়গা ও পায়খানার সু-বন্দোবস্ত ছিল, সেখানে নিশ্চয়ই ধনী লোকেরা বাস করতো। আবার আরো একরকম বাড়ি পাওয়া গেছে যেগুলি সারিবদ্ধভাবে কাঁচা ইটের তৈরি। এই সকল বাড়িতে গরীব লোকেরা বাস করতো। এছাড়া আরো একরকম শ্রেণীবিভাগ ছিল, যেমন কেউ ছিল পুরোহিত, কেউ-বা বণিক, অথবা কামার, ছুতোর, কুমোর। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ ছিল কিনা তা জানা যায় না।

এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে সিন্ধুতীরের সভ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সবই কি লোপ পেয়ে গেছে? আমরা যদি একটু গভীর ভাবে ভাবি তাহলে দেখবো তা যায় নি। এখনও আমাদের মাটির বাসনপত্র, কলসি, গেলাস, ঘটি, খেলনার পুতুল অনেক কিছুই সে-যুগের ঢঙে গড়া হয়ে থাকে।

সে-যুগের গরুর গাড়ি এখনও সমান ভাবেই চলছে। সেকালের অনুকরণে সুতাকাটার জন্য আমরা টেকো ব্যবহার করি। হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাসে যে তাদের অবদান রয়েছে তা আমরা একটু আগেই দেখেছি। তাই একথা বললে ভুল হবে না যে, সিন্ধুতীরের সভ্যতা একেবারে মরে যায় নি। আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে তার কিছু কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ২৫০০-১৫০০ সিন্ধুসভ্যতার যুগ।

ঘ. *চীনদেশের সভ্যতার সূচনা*

হোয়াং-হো এবং ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকাভূমি : এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ চীন। আর পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি মানুষ এখানে বাস করে। কিন্তু প্রাচীন যুগে চীন বলতে বোঝাতো হোয়াং-হো-ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকা-ভূমি। যুগ যুগ ধরে পলিমাটি জমা হয়ে এই সুজলা-সুফলা অঞ্চলটি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন যুগে সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে এই অঞ্চলটি ছিল একটি আদর্শস্থল।

চীনের আদি ইতিহাস : আমরা এর আগে দেখেছি যে চীনের 'প্রথম মানুষ' পিকিং-এর কাছে বন-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়-পর্বতে বাস করতো। এর হাজার হাজার বছর পরে, নব প্রস্তরযুগে, হোয়াং-হো-ইয়াংসি-কিয়াং-এর তীরে সর্বপ্রথম মানুষের বসতির চিহ্ন দেখা যায়। সে-যুগের অন্যান্য স্থানের লোকদের মত চীনের এই প্রাচীন মানুষরাও চাষ-আবাদ ও পশুপালন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো। এদের প্রধান ফসল ছিল যব এবং বাজরা। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল গরু, ভেড়া, ছাগল, শূয়োর এবং কুকুর। গোল করা বড়ো বড়ো গর্তের উপর ছাউনি দিয়ে এরা বাস করতো। এরাও নানান রকম মাটির পাত্র তৈরি করতো। একরকম কালো রঙের চকচকে পাত্রের জন্য এদের খুব খ্যাতি ছিল।

চীনের উপকথা ঃ চীনের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে। তখন সাঙ্ বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। তার আগের যুগ সম্বন্ধে কতকগুলি উপকথার প্রচলন আছে, তা থেকে আদি যুগের কয়েকজন রাজার কথা জানা যায়। চীন-সভ্যতার গোড়াপত্তন নাকি তাঁদের সময় হয়েছিল। সাধারণ লোকের ধারণা যে, এঁদের রাজত্বকাল ছিল চীনের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। কেমন করে মাছ ধরতে হয়, কি দিয়ে রেশম তৈরি করতে হয়, কি করে লিখতে হয়—এই সব বিদ্যা নাকি তাঁরা প্রজাদের শিখিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গীত এবং চিত্রকলাও এই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজন রাজা চুম্বক পাথর আবিষ্কার করেন। আর একজন রাজা গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে জানবার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

হোয়াং-হো নদীকে অনেক সময় বলা হয় চীন দেশের **দুঃখের নদী**। এই নদীটিতে প্রায়ই দারুণ প্লাবন দেখা দেয়। তখন মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের ঘরবাড়ি, পথঘাট, জমিজমা, ক্ষেতখামার, সব কিছু ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই হোয়াং-হো নদীর প্লাবনের কাহিনী চীনাদের উপাখ্যানে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। এই সর্বনাশা নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে কি করে বেঁচে থাকা যায় তার পথ দেখিয়েছিলেন স্বর্ণযুগের শেষ রাজা য়ু। শোনা যায় যে তাঁর রাজত্বকালে একবার হোয়াং-হো নদীতে প্রবল বন্যা নেমেছিল। তাতে 'সমস্ত পৃথিবী' ভেসে যায়। তখন 'য়ু' খাল কেটে বাঁধ বেঁধে বন্যার জল রোধ করলেন। সকলেই প্রাণে বেঁচে গেল। তারা বললো যে, "য়ু যদি না থাকতেন তাহলে আমরা সবাই মাছ হয়ে যেতাম।" চীনের মানুষ তাই য়ুকে দেবতার মত পূজা করতো।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই স্বর্ণযুগকে কাল্পনিক বলে মনে করেন। তবে অনেকে একথা বলেন যে, এই আদিযুগে চীনারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার শিখেছিল; কি করে চাকাওয়ালা গাড়ি তৈরি করতে হয়, কি করে রেশমের সুতা পাওয়া যায় তাও তাদের অজানা ছিল না। তারা বোধহয় নানারকম সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতেও শিখেছিল। তখন হোয়াং-হো-ইয়াংসি-

কিয়াং-এর তীরে অনেকগুলি মাটির দেওয়াল-ঘেরা শহর গড়ে ওঠে। এইভাবেই প্রায় চার হাজার বছর আগে চীন-সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ২৭০০-২২৫০ প্রাচীনতম সম্রাটদের যুগ।

ঙ. নদীতীরে উদ্ভূত সভ্যতাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য

হাতিয়ারের কথা ঃ আদি যুগে নদীর তীরে যে চারটি সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা হাতিয়ারগুলির কথা বলেই শুরু করবো। কারণ নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি করেই মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা দেখি আদি সভ্যতার যুগে মানুষ সর্বত্র ব্রোঞ্জের নির্মিত হাতিয়ার ব্যবহার করছে। এতে তফাত হলো কি? একটু ভেবে দেখলেই তা বোঝা যাবে। মানুষ যখন পাথরের কোদাল ব্যবহার করতো তখন কতটা ফসল ফলাতে পারতো? প্রাণপণ চেষ্টা করে তারা কোনোমতে নিজেদের বাঁচবার মত খাদ্য যোগাড় করতে পারতো। কিন্তু ব্রোঞ্জের হাতিয়ার উন্নত এবং মজবুত হওয়াতে অনেক বেশি ফলন সম্ভব হয়েছিল, আর এর ফলেই নাগরিক জীবনযাত্রার সূত্রপাত হয়।

শহরের কথা ঃ যতদিন কৃষিকার্য ও পশুপালন ছিল মানুষের জীবনধারণের একমাত্র উপায়, ততদিন তারা গ্রামে বাস করতো। উন্নত ধরনের হাতিয়ার তাদের সভ্যজীবনযাপনের দিকে এগিয়ে দিলো। কিন্তু এর ঝামেলা ছিল অনেক। কারণ সভ্যজীবনযাপন করতে হলে চাই পথঘাট, চাই দালান-কোঠা, চাই নানা রকম শিল্পসামগ্রী। তাই বহু মানুষ গ্রাম ছেড়ে জায়গায় জায়গায় এসে জড়ো হলো। তারা ছোট ছোট শহর গড়ে তুললো। সেকালের সব দেশেই শহরগুলির পত্তনও হয়েছিল নদীর কিনারা ঘেঁষে। নদী থেকে শস্যক্ষেত্রে সরবরাহের জন্য প্রচুর জল পাওয়া যেত, আর নৌকো বেয়ে চলাচলেরও বেশ সুবিধা হয়েছিল। সেকালের সব শহরগুলিই দেখতে ছিল প্রায় একরকম—পথঘাট, দালানকোঠা, দোকান-পাটে ভর্তি। আরও দেখা যেতো যে, নানা লোক নানা

কাজে ব্যস্ত। শহরের চারদিকে থাকতো মাটির দেওয়াল ; তার বাইরে ছিল বড়ো বড়ো ক্ষেতখামার। সেখানে চাষীরা বাস করতো।

শিল্পের কথা ঃ সেকালে বিভিন্ন দেশে যে সব শিল্পের বিকাশ হয় তাতেও আমরা কতকগুলি মিল দেখতে পাই। যেমন মৃৎ-শিল্পের কথাই ধরা যাক। এই শিল্পের সূচনা হয়েছিল নব প্রস্তরযুগে। কিন্তু সভ্যতার আদি যুগে সর্বত্রই সেগুলিকে নানা রঙ দিয়ে চিত্রাঙ্কিত করে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হতো। এদের গড়নের কাজেও মিল আছে। ধাতু-শিল্পের বেলায়ও এই একই কথা বলা চলে। যেমন ব্রোঞ্জের হাতিয়ারগুলি দেখতে ছিল অনেকটা একরকমের। প্রস্তরখচিত গহনা তৈরি করবার রীতিও এই সময় প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। এ যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল গরুর টানা গাড়ি। এগুলির নির্মাণ-কৌশলেও সাদৃশ্য ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ঃ তখনকার সাধারণ মানুষদের প্রয়োজন ছিল খুবই অল্প। তারা খাওয়াপরার জিনিস যোগাড় করতে পারলেই কৃতার্থ মনে করতো। কিন্তু তখন শহরবাসী কিছু লোকের হাতে অনেক ধন-দৌলত জমে গিয়েছিল। তারা জাঁকজমক ভালবাসতো। তাদের উৎসাহে নানারকম শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। ধনী লোকদের বিলাসব্যসনের চাহিদা মেটাবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে নানারকমের মূল্যবান জিনিসপত্র আহরণ করা হতো। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে সুমের, মিশর, এবং সিন্ধুতীরবাসীরাই অগ্রণী ছিল।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক চিত্র ঃ বিভিন্ন স্থানে সেকালে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তারও রূপ ছিল অনেকটা একই রকম। সভ্যজীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই মানুষদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের সূচনা হয়। যারা ধন-দৌলতের মালিক ছিল তারা হলো 'বড় লোক'। এদের নিয়ে একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে। এই দলে ছিলেন রাজা, উজির, মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতি। যারা বাকি রইলো তারা হলো শ্রমজীবী জনসাধারণ—নিম্নশ্রেণীর লোক। এদের মধ্যে যারা শিল্পের কাজ করতো তারা নিজেদের একটু উঁচু স্তরের লোক বলে মনে করতো। সমাজের সবচেয়ে নীচু স্তরের

লোক ছিল ক্রীতদাসেরা। তাদের নিজস্ব কোনো সত্তা ছিল না। মালিকদের মর্জির উপর তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করতো।

সেকালে সভ্য জগতের সব জায়গায়ই কৃষি ছিল প্রধান সম্পদ্। এর উপরে সকলেরই বাঁচা-মরা নির্ভর করতো। কৃষকরা ফসল ফলাতো, কিন্তু তারা তার সম্পূর্ণ মালিক ছিল না। ফসলের বেশির ভাগই যেত সুমেরের মন্দিরে, মিশরের 'বড় বাড়ি'তে, মোহেঞ্জো-দড়ো-হরপ্পার গোলাঘরে। চীনেও যে অন্যরকম ছিল তা মনে হয় না। এই সব জমা শস্যের কিছু খেতো শাসকগোষ্ঠীর লোকজনেরা; যারা তাদের জন্য কাজকর্ম করতো, তাদের মধ্যেও কিছু বিতরণ করা হতো; বাকি যা থাকতো তা দিয়ে ব্যবসা চলতো। কৃষকদের নিজেদের ভাগে পড়তো ততটুকু—যা তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন হতো। তখন নানারকম শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছিল। কিন্তু তাদের শ্রমের বিনিময়ে যে সম্পদ্ জমা হতো তা জনসাধারণের কাজে লাগতো না। আমরা আগেই দেখেছি যে, এদের জোর করে খাটিয়ে নেওয়া হতো। এখানকার বস্তির মত গড়া বাড়িতে এরা বাস করতো।

অন্যদিকে আমরা কি দেখতে পাই ?- অভিজাত বংশের মানুষেরা প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করছে। সমস্ত বাড়ি সু-সজ্জিত—অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত আসবাবপত্রে ভরা, দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর চিত্র, স্থানে স্থানে নিপুণ ভাস্করদের তৈরি মূর্তি। এদের পোশাক-আচ্ছাদনের ঘটাও কম ছিল না। সূক্ষ্মবস্ত্রে তাদের দেহ আবৃত থাকতো, গলায় থাকতো বহু মূল্য পাথর-খচিত সোনার হার, হাতে বালা। তাদের খাবারদাবারের কোনো অভাব-অনটন ছিল না। নিজের হাতে এরা কোনো রকম কাজকর্ম করতো না। হুকুম পালনের জন্য চাকর-বাকর এবং ক্রীতদাসদের সর্বত্র মোতায়েন করে রাখা হতো। কিন্তু এইসব বড়লোকদের কাছে আমরা অনেকাংশে ঋণী। কারণ এদের চেষ্টা ও যত্নে মানবসভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। প্রাচীনতম সভ্যতার নাম বল।

২। কোন্ দুইটি নদীর মাঝখানের অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া ?

৩। কোন্ অঞ্চলকে সুমের বলা হত?
৪। পৃথিবীতে প্রথম ইট কারা তৈরি করেছিল?
৫। সুমেরবাসীদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র কি ছিল?
৬। সুমেরীয়দের কয়েকজন দেব-দেবীর নাম কর।
৭। সুমেরবাসীদের প্রধান পুরোহিতের কিরূপ ক্ষমতা ছিল?
৮। সুমেরে দেওয়ালচিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে কেন?
৯। সুমেরীয়রা কোন্ কোন্ ধাতুশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করে?
১০। সুমেরীয়ররা কিভাবে নৌকা তৈরি করত?
১১। সুমেরীয়দের লিপিকে কি বলা হয়?
১২। মিশর দেশটি কোথায় অবস্থিত?
১৩। মিশরের প্রধান নদীর নাম কি?
১৪। মিশরীয়রা তাদের বাসভূমিকে কি বলত?
১৫। মিশরের প্রধান সম্পদ্ কি?
১৬। মিশরকে 'নীল নদের দান' কে বলেছিলেন?
১৭। কে সর্বপ্রথম মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন?
১৮। 'পের-ও' কথাটির অর্থ কি?
১৯। ফেরোরা কি দাবী করতেন?
২০। প্যাপিরাস কি?
২১। ফেরোদের পাথরের তৈরি কবরের নাম কি?
২২। কোন্ ফেরোর কবর থেকে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া গেছে?
২৩। প্রস্তরের আধারে রাখা প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতদেহকে কি বলা হত?
২৪। মিশরীয়দের কয়েকটি দেবতার নাম কর।
২৫। কারনাকের মন্দির কাকে বলে?
২৬। মোহেঞ্জো-দ্বড়ো কথাটির অর্থ কি?
২৭। সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব কে আবিষ্কার করেন?
২৮। মোহেঞ্জো-দড়োর বিরাট স্নানাগারের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কত ছিল?
২৯। মোহেঞ্জো-দড়োতে বাড়িঘর কিসের তৈরি ছিল?
৩০। সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক কয়েকটি সভ্যতার নাম কর।
৩১। সিন্ধুসভ্যতার লোকদের কয়েকটি দেবদেবীর নাম কর।
৩২। সিন্ধুসভ্যতা এখন থেকে কত বছর আগে নষ্ট হয়?
৩৩। চীন সভ্যতার গোড়াপত্তন কাদের সময় হয়?
৩৪। কোন্ নদীকে 'চীন দেশের দুঃখের নদী' বলা হয়?
৩৫। স্বর্ণযুগের একজন কাল্পনিক রাজার নাম কর।
৩৬। আদি যুগে শহরগুলি কোন্ কোন্ নদীতীরে গড়ে উঠেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ কোন্ নদীমাতৃকা অঞ্চলে পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল ?
২। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা দক্ষিণ অঞ্চলে প্লাবনরোধের কি ব্যবস্থা করেছিল ?
৩। সুমেরীয়রা কত বছর আগে কোথায় এসে উপস্থিত হয় ?
৪। সুমেরবাসীরা কি কি বৃত্তি গ্রহণ করেছিল ?
৫। সুমেরীয়রা কিভাবে ইট দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি শুরু করে ?
৬। "উর" শহরের রাজাদের কবর খুঁড়ে কি কি পাওয়া গেছে ?
৭। 'কিউনিফর্ম' লিপি কি ? কারা ইহা ব্যবহার করতো ?
৮। মিশরের অবস্থান কিরূপ ছিল ?
৯। নীলনদ মিশরের প্রধান সম্পদ্ ছিল কেন—আলোচনা কর।
১০। মিশরীয় সমাজে ফেরোদের কিরূপ ক্ষমতা ছিল ?
১১। মিশরীয় সমাজে পুরোহিতদের স্থান কিরূপ ছিল ?
১২। মিশরীয়দের চিত্রলিপি সম্বন্ধে কি জান ?
১৩। লিখবার জন্য কি কি প্রয়োজনীয় বস্তু মিশরীয়রা আবিষ্কার করে ?
১৪। মিশরে কাদের কর সংগ্রাহক বলা হতো ? তাদের কি কাজ ছিল ?
১৫। মিশরীয় সমাজের শ্রমজীবীদের অবস্থা কেমন ছিল ?
১৬। মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কি জান ?
১৭। সিন্ধু সভ্যতার নগর-পরিকল্পনা বর্ণনা কর।
১৮। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা কি ধরনের পোশাক ব্যবহার করতো ?
১৯। সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিসের পরিচয় দাও।
২০। সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা কোন্ কোন্ শিল্পে নৈপুণ্য অর্জন করেছিল ?
২১। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের ধর্ম সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ?
২২। চীনের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কি জান ?
২৩। চীনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোন্‌টি ?
২৪। রাজা য়ু কে ? তাঁকে কেন চীনের মানুষ দেবতার মত পূজো করতো ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মেসোপটেমিয়ায় অধিবাসীদের সেচব্যবস্থা, স্থাপত্যকলা ও লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান ?
২। প্রাচীন মিশরীয়দের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। পিরামিড কাকে বলে? পিরামিডের গঠন-প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। প্রাচীন মিশরে অভিজাতশ্রেণী ও সাধারণ মজুর শ্রেণীর জীবন-যাপনের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৫। সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ধর্ম ও খাদ্য সম্বন্ধে কি জান?

৬। মোহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় মাটি খুঁড়ে যে যে জিনিস পাওয়া গেছে তার বিবরণ দাও।

৭। চীনের উপকথা থেকে কি জানতে পারা গেছে?

৮। নদীতীরে উদ্ভূত সভ্যতাগুলির মধ্যে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে কি সাদৃশ্য পাওয়া যায়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মেসোপটেমিয়া হল — ও — নদীর মাঝখানের অঞ্চল।

(খ) শহরের ঠিক মাঝখানে সুমেরীয়রা — স্থাপন করতো।

(গ) পুরোহিতরা ছিলেন রাজার —।

(ঘ) সুমেরীয়দের একটি বিখ্যাত শহরের নাম —।

(ঙ) অখণ্ড মিশরের রাজার উপাধি ছিল —।

(চ) মিশরের করের পরিমাণ ছিল —।

(ছ) মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড — একর জমির ওপর অবস্থিত।

(জ) মোহেঞ্জো-দড়ো নামটির অর্থ — —।

(ঝ) হরপ্পাতে একটি বড় — পাওয়া গেছে।

কোন্‌টি ঠিক বল :

(ক) মেসোপটেমিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা ছিল—রাজপ্রাসাদ/দেবতার মন্দির।

(খ) সুমেরে পাথর—পাওয়া যেত / অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হতো।

(গ) মিশরকে বলা চলে—একটি মরুদ্যান / একটি সাগর / একটি জলাশয়।

(ঘ) পের-ও কথাটির অর্থ মানুষ / বাড়ি / খামার।

(ঙ) মিশরীয় লিপিকে বলে — কিউনিফর্ম / হাইরোগ্লিফিক।

(চ) প্যাপিরাস শব্দ হইতে আসিয়াছে—লিপি / পেপার / পিপুল গাছ।

(ছ) মিশরের মৃতদেহগুলিকে বলা হোত—পিরামিড / শব / ম্যমি।

(জ) সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়—১৯২০ / ১৯৫৫ / ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগ ও সামাজিক পরিবর্তন

লৌহযুগের সূচনা : ঘুরে ফিরে আমাদের সেই হাতিয়ারের কথায়ই আসতে হলো। কারণ, কি রকম জিনিস দিয়ে মানুষ হাতিয়ার তৈরি করতো তাই দেখে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন যুগ নির্ণয় করেন। আমরা এর আগে দেখেছি যে, প্রাচীনতম কালকে বলা হয় প্রস্তরযুগ। এর পরে যখন তামা এবং ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতে থাকে তখন শুরু হয় তামা এবং ব্রোঞ্জের যুগ। এই যুগ প্রায় দু'হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর পরের যুগকে ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন লৌহযুগ। এখনও এই যুগই চলছে।

লৌহের আবিষ্কার : লোহার কোনো-না-কোনো রকম ব্যবহার একরকম সুপ্রাচীনতম কাল থেকে চলে আসছিল। এই ধাতুটি পৃথিবীর উপরের স্তরে নানা জায়গায় পাওয়া যায়। তামা ও টিনের মতো এই বস্তুটি খুব দুর্লভ নয়। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, জলো হাওয়ায় লোহায় জং ধরে এবং তা লাল হয়ে যায়। আদি প্রস্তরযুগের মানুষ লোহার উপরের লাল রঙ্ সংগ্রহ করে মুখে এবং গায়ে মাখতো। আবার এই যুগের শেষে দেখি এই রঙ্ দিয়ে তারা ছবি আঁকছে। ব্রোঞ্জ যুগের প্রায় প্রথম থেকে দেখা যায় যে, লোহা গালিয়ে আংটি, বালা, তাবিজ প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তখন মাটি খুঁড়ে লোহা বার করা হতো না। আকাশ থেকে পড়া উল্কাপিণ্ড থেকে এই জিনিসটি পাওয়া যেতো। সুমের এবং মিশরের লোকেরা মনে করতো যে, জিনিসটি যখন আকাশ থেকে পড়ছে, তখন নিশ্চয়ই এর দৈবগুণ আছে। তাই তারা লোহাকে খুব মূল্যবান বলে মনে করতো। কিন্তু তখনকার কোন সভ্য জাতি ইস্পাত তৈরি করতে জানতো না। তাই লোহার প্রকৃত গুণ তাদের অজানা ছিল।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ইস্পাত তৈরি করবার পদ্ধতি একদল অসভ্য লোকের আবিষ্কার। তারা এশিয়া মাইনরের পূর্ব প্রান্তে বাস

করতো। প্রাচীন গ্রীকেরা এদের নাম দিয়েছিল 'কলিবিস্' অর্থাৎ লৌহকার। তখন এখানে হিট্টাইট্ নামে একটি জাতি রাজত্ব করতো। তারা অনেকদিন এই আবিষ্কারের কথা গোপন রেখেছিল। কিন্তু নিজেরা ইস্পাতের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুবই পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। মিশরের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধে। দুই পক্ষেই অনেক বিদেশী ভাড়াকরা সৈন্য ছিল। যারা হিট্টাইট্দের পক্ষে ছিল তারা ইস্পাত তৈরির গোপন কথাটি ফাঁস করে দেয়। ক্রমে মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে ইস্পাতের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার চালু হয়। এই সময় থেকে লৌহযুগের আরম্ভ। এরপর যীশু খ্রীস্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে সভ্যজগতের সর্বত্র লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন: তামা এবং ব্রোঞ্জ দুর্লভ বলে সাধারণ লোকের পক্ষে সে সব জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। এগুলির দামও ছিল খুব বেশি। তাই ব্রোঞ্জের যুগ ছিল বড়-লোকেদের যুগ। লোহা কিন্তু অনেক সহজেই পাওয়া যেতো, দামেও ছিল সস্তা। তাই যন্ত্রপাতির জন্য শিল্পী ও চাষীদের আর রাজা, মন্দিরের পুরোহিত এবং ধনীলোকের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হতো না। অতি সাধারণ শিল্পীরাও তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিজেরাই কিনতে পারতো। চাষীরাও তাদের কুড়াল, কাটারি, কাস্তে এবং লাঙলের ফলা কামারদের দিয়ে গড়িয়ে নিতো। এর ফলে বন-জঙ্গল কেটে তাদের পক্ষে জমিজমা বাড়াবার পথ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে লৌহযুগে সমাজে নিম্নস্তরের লোকদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল।

রাজ-ক্ষমতার বৃদ্ধি: ব্রোঞ্জের যুগে অর্থবান ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়া রাজাদের চলতো না। যুদ্ধবিগ্রহ বাধলে এরাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজার পক্ষে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসতো। তাই রাজা সহজে এদের ঘাঁটাতে চাইতেন না। কিন্তু যখন ইস্পাতের তৈরি তলোয়ার, খাঁড়া, কুড়াল, বর্শা প্রভৃতি তৈরি হলো তখন সাধারণ লোকের পক্ষেও এগুলি যোগাড় করা সহজ হয়। এদের সৈন্যদলে ভর্তি করে রাজা যুদ্ধ

করতে পারতেন। তাই লৌহযুগে যুদ্ধের ব্যবসা ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। এই ভাবে ক্রমে রাজাদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।

স্মরণীয় তারিখ

আঃ খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ লোহার সর্বপ্রথম আবিষ্কার
" " ৮০০ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র লৌহনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কোন্ যুগের পর লৌহযুগ আসে ?
২। সুমের এবং মিশরীয়া লোহাকে মূল্যবান মনে করত কেন ?
৩। ইস্পাত কারা আবিষ্কার করে ?
৪। ইস্পাত তৈরির কথা কিভাবে জানা-জানি হয়ে যায় ?
৫। লোহার ব্যবহার সমগ্র সভ্যজগতে কবে প্রচলিত হয় ?
৬। ব্রোঞ্জের যুগকে বড়লোকদের যুগ বলা হয়েছে কেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। লোহা ও ব্রোঞ্জের মধ্যে তফাৎ কি ?
২। যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে চাষীদের কি সুবিধা হয়েছিল ?
৩। ব্রোঞ্জের যুগে রাজারা অর্থবান ব্যক্তিদের অসন্তুষ্ট করতেন না কেন ?
৪। লৌহ আবিষ্কারের পর যুদ্ধের ব্যবসা ধনীদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি কেন ? এর ফল কি হয়েছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। লৌহের আবিষ্কার কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ? লৌহযুগে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হয় ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : ঠিকমত সাজিয়ে লেখ :

(ক) প্রাচীনতম কালকে বলা হয়	(ক) অবস্থার উন্নতি হয়েছিল।
(খ) তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ	(খ) মিশরীয়দের।
(গ) এশিয়া মাইনরের পূর্ব প্রান্তে	(গ) প্রস্তর যুগ।
(ঘ) হিট্টাইট্দের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে	(ঘ) প্রায় দু' হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল।
(ঙ) লৌহযুগে সমাজে নিম্নস্তরের লোকদের	(ঙ) হিট্টাইট্ নামে এক জাতি রাজত্ব করতো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক. ব্যাবিলনের সভ্যতা

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার জন্ম: শস্য-শ্যামল মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। এখানে অনেকগুলি যাযাবর দল বাস করতো। আরব ও ইহুদীদের মতো এরাও ছিল সেমিটীয় জাতির লোক। সুমারবাসীরা এদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহও হতো। একবার একদল যাযাবর জাতি সুমার দখল করে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করেছিল। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ রাজা ছিলেন সারগন। তিনি সুমার জয় করে পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু সুমারের লোকে এই পরাধীনতা মেনে নেয়নি। তারা আবার স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আবার একটি নতুন সেমেটীয় জাতি এসে সমস্ত দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া জয় করে। তাদের রাজধানী ছিল ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে। নাম ছিল ব্যাবিলন। রাজধানীর নামে তাদের রাজ্যের নামও হয় ব্যাবিলন। এই নতুন লোকেরা সুমারবাসীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছিল। এরা সুমেরীয় সভ্যতাকে আপন করে নেয়। শুধু তাই নয়, এদের রাজত্বকালে এই সভ্যতার আরো বেশি উন্নতি হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা এর নতুন নাম দিয়েছেন ব্যাবিলনের সভ্যতা।

কৃষি ও বাণিজ্য: সুমেরীয়রা কৃষির উন্নতি করেই প্রথম সভ্যতার পথে পা দিয়েছিল। কৃষিই ছিল মেসোপটেমিয়ার প্রধান সম্পদ্। একে কোনরকমে অবহেলা করা যেতো না। ব্যাবিলন-বাসীদেরও এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাই এরা দেশের ভিতরের খাল ও বাঁধগুলিকে সযত্নে রক্ষা করতো। নতুন নতুন জাতির আগমনের ফলে মেসোপটেমিয়ার লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনোদিন তাদের খাদ্যের অভাব হয়নি।

মেসোপটেমিয়ার ধনসম্পদ্ বাড়াবার আর এক উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। এ বিষয়েও সুমেরীয়রা পথ দেখিয়েছিল। ব্যাবিলনের

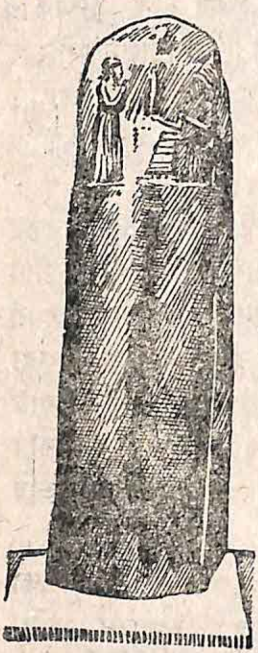
লোক জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো। বণিকেরা দল বেঁধে গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে অন্যদেশে যাতায়াত করতো। জলপথে এদের সঙ্গে ইরান ও ভারতবর্ষের সংযোগ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য বণিকদের মধ্যে অনেকে একত্র হয়ে এখনকার মতো কোম্পানি ও ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলনবাসীদের তৈরি পশমের বস্ত্র এবং রত্নভূষিত কারুকার্যের তখন খুব খ্যাতি ছিল; আর ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে এদের রাজধানীর খুব নামডাক ছিল। বহু বিদেশী বণিক এখানে এসে জড়ো হতো।

মন্দির ও পুরোহিত: সুমেরীয় রীতি অনুসরণ করে ব্যাবিলনীয়রাও অনেক বড়ো বড়ো মন্দির নির্মাণ করেছিল। তারা বহু দেবদেবীর পূজা করতো। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্যাবিলনের নগর-দেবতা 'মারডুক্'। তাঁকে দেবতাদের রাজা বলে মনে করা হতো। ব্যাবিলন শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর পূজার জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করা হয়। দেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'ইস্টার'। পরবর্তীকালে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অধিবাসীরাও তাঁর পূজা করতো।

সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখনও পূর্বের মতো বজায় ছিল। স্বয়ং রাজাও তাঁদের যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। এঁরা সাধারণ লোকজনদের কাছে দৈববাণীর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন। এছাড়া তাঁরা দেবতাদের নিকট ভেড়া বলি দিয়ে তার যকৃৎ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি কিভাবে ঘোরাফেরা করছে তা দেখে এঁরা ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারতেন। আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা এখনও এইভাবেই ভাগ্য গণনা করেন।

বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতি: ব্যাবিলনবাসীরা সুমেরীয় লিপি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের নিজস্ব পৃথক্ ভাষা ছিল। তবে দেবদেবীর পূজা-অর্চনার সময় এরা সুমেরীয় ভাষা ব্যবহার করতো। তখন অনেক বিদ্যালয় ছিল। কি করে লিখতে হয়—ছাত্রদের বিশেষ করে তাই শেখানো হতো। তারা কাঠের কলম দিয়ে নরম কাদা মাটির তৈরি 'শ্লেটের' উপর লিখতো। লেখা শেষ হলে তা হাত দিয়ে ঘষে মুছে ফেলা হতো। সেকালের ব্যাবিলনবাসীরা গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিল। পুরোহিতরা যত্নের সঙ্গে

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করতেন। পাটীগণিত, বীজগণিত এবং ফলকে লেখা এদের একখানি 'নামতা'র বই পাওা গেছে। ব্যাবিলনের পণ্ডিতরা সাহিত্যেরও সৃষ্টি করেছিলেন। লেখাপড়া জানা লোক পদ্য পড়তে ভালবাসতো। গিলগামেস্ নামে একজন বিখ্যাত বীরের কাহিনী নিয়ে একখানি 'মহাকাব্য' রচিত হয়েছিল। ব্যাবিলনেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সেখানে মাটির ফলকে লেখা দলিলপত্র, ধর্মগ্রন্থ এবং জ্যোতিষ, গণিত ও সাহিত্যের বই জমা করে রাখা হতো। সকলেই তা পড়তে পারতো।



হামুরাবির বিধি

হামুরাবির আইন-সংহিতা: ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে খুব নাম-করা রাজা ছিলেন হামুরাবি। তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়ার উপর রাজত্ব করতেন। আশে-পাশের রাজ্য জয় করে তিনি পারস্য উপসাগর থেকে আরম্ভ করে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

হামুরাবি কিন্তু বিজেতা হিসাবে ইতিহাসে যতো খ্যাতিলাভ করেছেন তার চেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছেন পৃথিবীর প্রথম আইন-প্রণেতা হিসাবে। এই জন্যই তিনি অমর হয়ে আছেন। তিনি অনেকগুলি নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেছিলেন। তারপর দেশের সমস্ত প্রচলিত আইন সংগ্রহ করে তিনি একটি গোলাকৃতি প্রস্তর-স্তম্ভে খোদাই করে রাখেন। সবাই তা পড়তে পারতো। তাই বিচারকরা যেমন খুশি তেমন বিচার করতে পারতেন না। হামুরাবি বলতেন, সূর্যের দেবতা 'সামাস' এই আইনগুলি তাঁর কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এইজন্য, যে স্তম্ভটির উপর আইনগুলি লেখা হয়েছিল তার চূড়ায় দেখা যায় যে, সামাসের মূর্তির সামনে হামুরাবি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে।

সামাজিক চিত্র : হামুরাবি ব্যাবিলনের অধিবাসীদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ছিল অভিজাত বংশের লোক, যোদ্ধা এবং রাজকর্মচারী ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে বণিক, শিল্পী, চাষী প্রভৃতি সাধারণ লোকজন। ক্রীতদাসদের স্থান ছিল সকলের নীচে। আইনের চোখে এই তিন শ্রেণীর লোকদের মান-মর্যাদা এবং অধিকার ছিল আলাদা আলাদা। যদি কেউ অন্যায় কাজ করতো তা হলে সে কোন্ শ্রেণীর লোক তাই দেখে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। কিরকম তা দু' একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। যদি প্রথম শ্রেণীর কোনো লোক তার সমকক্ষ কোনো লোকের হাড় ভেঙে দিতো তা হলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি অপরাধীর হাড় ভেঙে দিতে পারতো। কিন্তু সেই একই লোক যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনো লোকের হাড় ভাঙতো তা হলে কিছু অর্থদণ্ড দিয়েই সে খালাস পেতো। আবার যদি কেউ প্রথম শ্রেণীর কোনো লোকের বাড়িতে চুরি করতো তাহলে তাকে চোরাই মালের ত্রিশগুণ খেসারত দিতে হতো। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের বাড়িতে চুরি করলে খেসারতের পরিমাণ হতো মাত্র দশগুণ। যদি বাড়ির ছাদ ভেঙে কারুর ছেলে মারা যেতো তাহলে যে মিস্ত্রী বাড়িটি তৈরি করেছিল তার ছেলেটিকে বাড়ির মালিক মেরে ফেলতে পারতো।

হামুরাবি-প্রণীত আইন খুবই কঠোর ছিল। "চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত", এই নীতি অবলম্বন করে এই আইন রচিত হয়েছিল। হামুরাবি কিন্তু মেয়েদের, বিশেষত বিধবাদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি তাঁদের স্বামীর সম্পত্তি পাবার অধিকার দিয়েছিলেন। এই রকম আইন সে যুগে কেন, এযুগে এখনও পর্যন্ত সর্বত্র প্রচলিত হয়নি। হামুরাবির আর একটি কীর্তি—তিনি বিনা বেতনে শিশুদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ২৭৫০ সারগণ।
" " ২১৫০ উর নম্মু।
" " ১৭৮৩ হামুরাবির বিজয় অভিযান।

খ. মিশরবাসীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

হিকসোজ্ রাজত্ব: মিশরের ফেরোরা সকলেই পরাক্রমশালী ছিলেন না। দুর্বল ফেরোদের রাজত্বকালে বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-কর্তারা ক্ষমতা দখল করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতেন। এর ফলে সমস্ত দেশে অরাজকতা দেখা দিতো। এক সময় বহুকাল ধরে এই রকম অরাজকতা চলেছিল। তার ফলে মিশর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে পশ্চিম এশিয়া থেকে একদল লোক মিশরে প্রবেশ করেছিল। এরা ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করতো। মিশরবাসীরা সে সময় রথযুদ্ধের কৌশল জানতো না। এরা ঘোড়াও তার আগে দেখেনি। আক্রমণকারীরা প্রায় বিনা বাধায় উত্তর মিশর জয় করে সেখানকার রাজা হয়ে বসলো। ইতিহাসে এরা হিকসোজ্ বা মেষ-পালক রাজা বলে পরিচিত।

হিকসোজ্‌দের রাজত্ব প্রায় এক শ' বছর স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু তারা সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। মিশরবাসীরা তাদের কাছ থেকে কি করে রথে চড়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই বিদ্যাটি শিখেছিল। এছাড়া তারা স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশী রাজাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করে যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে ওঠে। অবশেষে থিবস্ নগরের রাজা আহমোজ্ একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গঠন করে মিশর থেকে হিকসোজ্‌দের তাড়িয়ে দেন। এই সময় থেকে মিশরের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা: আহমোজ্ ও তাঁর বংশধররা এক নতুন নীতির প্রবর্তন করলেন। তাঁরা স্থির করেন যে, পশ্চিম এশিয়ায় রাজ্যবিস্তার করে মিশরকে সুরক্ষিত করতে হবে। এছাড়া সেখানকার ধনরত্ন আত্মসাৎ করাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এঁরা পশ্চিম এশিয়ায় অনেকগুলি অভিযান পাঠিয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন তৃতীয় থাটমোজ্। আহমোজ্-এর বংশধরদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। থাটমোজ্ প্যালেস্টাইন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ জয় করে ইউফ্রেটিস নদীর সীমানা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তারপর তিনি একটি পরাক্রমশালী রণতরী নির্মাণ

করে ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলি দ্বীপ নিজের অধিকারে আনেন। সুদানেও তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে মিশরবাসীরা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়।

ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা : পরাধীন দেশগুলিকে বশে রাখার জন্য থাটমোজ্ সেখানকার শহরগুলিতে মিশরীয় সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করেন। এই সকল স্থানের রাজকার্যও নিয়ন্ত্রিত হতো মিশরীয়দের দ্বারা। বিজিত দেশগুলি থেকে ফেরো কর হিসেবে প্রচুর ধনরত্ন পেতেন। নানা রকম ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে মিশরীয় সাম্রাজ্য প্রায় চার শ' বছর টিকে ছিল।

পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি : আহমোজ্ বংশের রাজধানী থিবসের নগর-দেবতা ছিলেন **আমন্**। রাজারা তাঁকে জাগ্রত দেবতা বলে মনে করতেন। তাঁদের ধারণা জন্মালো যে, আমনের আশীর্বাদেই হিকসোজ্‌দের বিতাড়িত করা এবং রাজ্যবিস্তার সম্ভব হয়েছিল। তাই রাজারা আমনের মন্দিরটিকে কারুকার্যমণ্ডিত করে সৌন্দর্যে তাকে অতুলনীয় করে তোলেন। তাঁর পূজা-অর্চনার জন্য রাজারা বহু অর্থ এবং জমিজমা দান করতেন। আমন্‌কে তাঁরা এত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন যে, একে একে মিশরের অন্যান্য শহরেও আমনের জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়ে ধনরত্ন দান করতেন। এইভাবে ব্যাবিলনের নগর-দেবতা মারডুকের মতো আমনও মিশরের সর্বপ্রধান দেবতা বলে সম্মান ও পূজা পেতেন। তখন থিব্‌সের মন্দিরের পূজারী হলেন মিশরের সর্বপ্রধান পুরোহিত। আমনের ধনসম্পত্তি ক্রমে এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু লোক ও পুরোহিত নিযুক্ত হন। এঁরা সকলেই প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজকর্ম করতেন। তখন তাঁর মানমর্যাদা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, কোনো ফেরোর পক্ষেও তাঁকে কোনোরূপ অবহেলা করার সাধ্য ছিল না।

আহমোজ্ বংশের **অ্যাখিনাটন্** নামে একজন ফেরো আমনের প্রধান পূজারীর ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি বহু দেবদেবীর পূজা না করে একমাত্র সূর্যের পূজা করতে প্রজাদের নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর উপাস্য দেবতার নাম

দেন অ্যাটন্‌। সকল মন্দির থেকে আমনের নাম মুছে ফেলা হলো। কিন্তু অ্যাখিনাটনের চেষ্টা সফল হলো না। তাঁর মৃত্যুর পর আবার জাঁকজমকের সাথে আমনের পূজা প্রচলিত হলো। যাতে তিনি পরলোকেও মুক্তি না পান সেইজন্য কবর খুঁড়ে দেহ বার করে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়। এরপর থেকে কোনো ফেরোই আমনের প্রধান পুরোহিতের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেতেন না। মিশরের শেষদিকের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পুরোহিতরাই ফেরোর পদ অধিকার করে সিংহাসনে বসেছেন।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব	১৬৮০-১৫৫০	হিক্‌সোজ্‌ প্রাধান্য
,,	১৫০১-১৪৪৭	তৃতীয় থাট্‌মোজ্‌

গ. পারসিক জাতির অভ্যুদয়

পৃথিবীর ইতিহাসে আর্যদের মতে খ্যাতি কোনো জাতি লাভ করতে পারেনি ; আর্য বলতে কিন্তু একটি বিশেষ জাতিকে বোঝায় না। প্রাচীন কালে একটি ভাষা প্রচলিত ছিল। এই ভাষায় যারা কথা বলতো তারা সকলেই আর্য বলে পরিচিত। এই ভাষাটি থেকে ক্রমে সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, ইরানী অর্থাৎ প্রাচীন পারসিকদের ভাষা প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল। আর্যরা প্রথমে কোথায় বাস করতো তা সঠিক কেউ বলতে পারেন না। এখান থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে তাদের মধ্য এশিয়ায় দেখা যায়। সেখানে তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে এক একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদের মধ্যেই একটি দল পারসিক নামে পরিচিত হয়। তারা পারস্য উপসাগরের কাছে বাস করতো। তাদের নাম থেকেই এই উপসাগরটির নামের উৎপত্তি।

পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারঃ পারসিকদের নিকটতম জাতি মিডিরা ইরান দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এক সময়ে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আশপাশের রাজ্যগুলি জয় করে তারা একটি বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। কিন্তু তাদের আধিপত্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। পারসিকদের রাজা **সাইরাস** মিডিদের শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেকেই সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

সাইরাস্ সেকালের একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার বহু বিখ্যাত দেশ জয় করেন। ব্যাবিলনও তাঁর অধিকারে আসে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে ভারতবর্ষের সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার প্রদেশ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এতবড় সাম্রাজ্য সে-যুগে আর কেউই স্থাপন করতে পারেনি। লোকে তাই তাঁকে "শ্রেষ্ঠ রাজা সাইরাস্" বলে অভিহিত করতো। সাইরাসের ছেলে **ক্যাম্‌বাইসিস্‌ও** একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মিশর দেশ জয় করেন।

ক্যাম্‌বাইসিসের হঠাৎ মৃত্যু হয়। তখন সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সকলে ভাবলো পারসিক সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু **দারায়ুস্** নামে ক্যাম্‌বাইসিসের একজন নিকট-আত্মীয় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সকল বিদ্রোহ দমন করলেন। এর পরে তিনি নিজেই সম্রাটের পদ অধিকার করেন।

দারায়ুস্‌ই ছিলেন পারসিক সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর রাজত্বকালে পারসিক সাম্রাজ্য পূর্ব ইউরোপে দানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরের রাজ্যগুলিও তিনি জয় করেছিলেন। ভারতবর্ষের লোকেরা তাঁকে কর হিসাবে ঝুড়িভরে সোনার গুঁড়ো দিতো।

ব্যাবিলন থেকে পারস্য দেশে যাবার পথে একটি পাহাড়ের গায়ে দারায়ূসের বীরত্ব-কাহিনী খোদাই করা আছে। সম্রাট তাঁর শত্রুদের পদদলিত করছেন; সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পরাধীন জাতিরা কর নিয়ে আসছে—এই রকম খোদাই-করা চিত্রও সেখানে দেখা যায়।

শেষ জীবনে দারায়ুস গ্রীস জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গ্রীকদের বীরত্বের জন্য তা পারেননি। তাঁর পুত্র জার্কসিজও এই একই চেষ্টা করে বিফল হন। গ্রীকদের হাতে বারবার পরাজিত হলেও পশ্চিম এশিয়ায় পারসিক শাসন অনেক দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

জরথুস্ত্রের কথা : আর্যরা অনেক দেবদেবীর পূজো করতো। কিন্তু পারসিকদের মধ্যে একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম জরথুস্ত্র। তিনি এক নতুন ধর্মমতের প্রচার

করেন। তিনি বলতেন, এই পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকার—এই সকল বিপরীত শক্তির মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে। যা ভালো, যা সত্য, যা আলোকময় তার প্রভু হলেন **আহুর-মাজদা**। আর যা কিছু মন্দ, মিথ্যা এবং তমসাচ্ছন্ন তার সৃষ্টি করেন **আহ্রিমন্**। তিনি লোকদের কাছে বলতেন যে, দুটি দেবতার মধ্যে যাঁকে খুশি তাঁকে পূজা করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, পরলোকে তোমাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জরথুস্ত্রের উপদেশসকল সংগ্রহ করে **আবেস্তা** নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই পুস্তকখানি হলো পারসিকদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

অনেকের ধারণা পারসিকরা অগ্নির উপাসক। কিন্তু তা ঠিক নয়। আলোকোজ্জ্বল আহুর-মাজদার বহিঃপ্রকাশ বলে তারা ঘরে বেদী তৈরি করে, তার উপর আগুন জ্বালিয়ে রাখতো ; সে আগুন কখনও নেভানো হত না। জরথুস্ত্র আগুন, জল, বাতাস এবং মাটিকে পবিত্র বলে মনে করতেন। তাই তাঁর ধর্ম যারা মানে তাঁরা মৃতদেহ আগুনে পোড়ায় না, জলে ভাসিয়ে দেয় না, মাটিতে কবরও দেয় না। শূন্যপ্রাণ দেহটিকে খুব উঁচু জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। শকুন প্রভৃতি পাখিরা দেহটি খেয়ে ফেলে।

প্রাচীন পারসিক **সম্প্রদায়** প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। একমাত্র ভারতবর্ষের বোম্বাই অঞ্চলে এখনও তাদের বংশধরদের দেখা যায়।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব ৫৫৮ সাইরাসের সিংহাসন আরোহণ
,, ৫৫২ দারায়ুসের সিংহাসন আরোহণ
,, ৪৯১-৯০ জার্কসিজের সিংহাসন আরোহণ
,, ৫৫১-৪৭৮ কনফিউসিয়াসের আবির্ভাব কাল

ঘ. ইহুদী জাতির ধর্মগুরু মোজেসের কথা

তোমরা হয়তো খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কথা শুনেছো। এই গ্রন্থখানির প্রথম অংশের নাম “ওল্ড টেস্টামেন্ট্”। এই অংশটি

থেকে ইহুদীদের প্রাচীন অনেক কথা জানা যায়। তারা প্রথমে ছিল যাযাবর। আরব মরুভূমির নানা জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াতো। এদের একটি দল ব্যাবিলনের শহর 'উর'-এ এসে বসবাস শুরু করে। তাদের নেতা ছিলেন এব্রাহাম। ইহুদীরা তাঁকে তাদের আদি পুরুষ বলে মনে করে। তিনি ভগবান জিহোবার আদেশে দেশত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। এর কিছুকাল পরে তারা বাসস্থান বদল করে মিশরে যায়। কেন গিয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে।

ইহুদীদের মিশরে আগমন: এব্রাহামের দৌহিত্র জেকবের বারোজন ছেলে ছিলো। এদের মধ্যে যোসেফ ছিলেন পিতার অধিক প্রিয়। তাই অন্য ছেলেরা ক্ষুব্ধ হয়ে যোসেফকে একজন মিশরীয় বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। তারা যোসেফের রক্ত-মাখা কাপড়-চোপড় দেখিয়ে জেকবকে বলে যে যোসেফকে বনের পশুরা মেরে ফেলেছে।

মিশরে এসে যোসেফ তাঁর প্রভুর খুব বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞানও অর্জন করেন। মিশরের ফেরো একদিন একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন ; কেউই তার অর্থ বুঝতে পারলেন না। যারা যোসেফকে জানতো তারা বললেন যে, হয়তো তিনি এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারেন। রাজসভায় যোসেফের ডাক পড়লো। তিনি ফেরোকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর স্বপ্নের অর্থ হলো মিশরে সাত বছর খুব ফসল ফলবে, কিন্তু পরের সাত বছর কিছুই ফলবে না ; দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। যোসেফের পরামর্শে ফেরো প্রথম সাত বছরের উদ্বৃত্ত শস্য জমিয়ে রাখলেন। কিন্তু পরের সাত বছরে কোনো কিছুই জন্মালো না। এইভাবে প্রকৃতই ফেরোর স্বপ্ন এবং যোসেফের ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রমাণিত হল। যা হোক, খাবার-দাবারের কোনো অভাব হলো না। মিশরীয়রা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বেঁচে গেলো। ফেরো সন্তুষ্ট হয়ে যোসেফকে মিশরের সকল জমিজমার তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করলেন।

রাজসভায় যোসেফের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে খুব বেড়ে গিয়েছিল। এদিকে একসময় দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

তখন যোসেফের ভাইরা শস্য কিনবার জন্য মিশরে আসে। তারা যোসেফকে চিনতে পারলো না; কিন্তু যোসেফ তাদের চিনলেন এবং ক্ষমা করলেন। তিনি তাঁর পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে মিশরে চলে আসতে বলেন। এইভাবে মিশরে ইহুদীদের আগমন ঘটেছিল।

এখনকার পণ্ডিতরা বলেন যে, বাইবেলের এই কাহিনীটি অতিরঞ্জিত। তাঁদের মতে ইহুদীরা খুব সম্ভব হিকসোজ্‌দের সঙ্গী হয়ে মিশরে প্রবেশ করেছিল। সেখানে তারা সুখ-শান্তিতেই বাস করতে থাকে। যোসেফের কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে, হিকসোজ্‌দের রাজসভায় উচ্চ পদ পেতে তাদের কোনো বাধা ছিল না।

ইহুদীদের ধর্মগুরু মোজেসের কাহিনী ঃ এরপরে যখন হিকসোজ্‌রা মিশর থেকে বিতাড়িত হয় তখন ইহুদীদের চরম দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। অনেক কষ্টের মধ্যে তাদের জীবনযাপন করতে হতো। তারপর রামেসিস্ নামে একজন ফেরো মিশরের সিংহাসনে বসেন। তিনি ইহুদীদের ক্রীতদাসের মত খাটাতেন। ইহুদীদের দিয়ে তিনি রাস্তাঘাট, মন্দির প্রভৃতি তৈরি করাতে শুরু করেন। এতে তাদের মধ্যে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়। কথিত আছে যে, ফেরোর হুকুমে ইহুদীদের নবজাত ছেলেদের মেরে ফেলা হতো। এই সময় এদের মধ্যে একজন মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর নাম মোজেস্। জন্মাবার পরেই তাঁর মা তাঁকে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দেন। ভাগ্যক্রমে ফেরোর কন্যা তাঁকে দেখতে পান এবং রাজপ্রাসাদে নিয়ে তাঁকে লালন-পালন করে বড়ো করেন।

মোজেস্ যখন জানতে পারলেন যে, তিনি ইহুদী, তখন তিনি তাঁর স্বজাতিদের নিয়ে মিশর ত্যাগের জন্য ফেরোর কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ফেরো কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন স্বয়ং জিহোবা মোজেসের সহায় হলেন। তিনি তাঁকে দৈবশক্তি দান করেন। দক্ষ যাদুকরের মতো মোজেস্ নানারকম দৃশ্য দেখিয়ে ফেরোকে ভয় পাইয়ে দেন। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেরো ইহুদীদের মিশর ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। মোজেস্ তাঁদের নিয়ে রওনা হলেন। কিন্তু ফেরো বড় সহজ লোক ছিলেন না। তিনি সৈন্য

পাঠিয়ে দিলেন ইহুদীদের ধরে আনতে। ততক্ষণে ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ পেছনে দেখা গেল ফেরোর অগণিত সৈন্য। সামনে সমুদ্র—পালাবার পথ নেই। ইহুদীরা প্রমাদ গণলো। কিন্তু মোজেস্ ভয় পেলেন না। তিনি তাঁর একখানি হাত জলের উপর রাখতেই সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে পথ করে দিল। ইহুদীরা ছুটে সমুদ্র পার হয়ে গেলো। কিন্তু সৈন্যরা ধাওয়া করে আসতেই দ্বিধা-বিভক্ত সমুদ্রের জল আবার এক হয়ে গেলো। ফেরোর সৈন্যরা সব জলে ডুবে মারা গেলো। এইভাবে মোজেস্ ফেরোর দাসত্ব থেকে ইহুদীদের মুক্ত করেন।

ইহুদীদের চরম দুঃখের দিনে মোজেস তাদের একমাত্র ভগবান জিহোবার উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছিলেন। তারা কিভাবে জীবনযাপন করবে সে বিষয়ে স্বয়ং জিহোবা মোজেসকে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশগুলি হলো: (১) ইহুদীরা জিহোবা ছাড়া অন্য কোনো দেবতার পূজা করবে না। (২) মূর্তিপূজা করবে না। (৩) ভগবানের নামে অযথা শপথ করবে না। (৪) পবিত্র জীবন যাপন করবে। (৫) মাতা-পিতাকে ভক্তি করবে। (৬) কাউকে হত্যা করবে না। (৭) নারীজাতির সম্মান রাখবে। (৮) চুরি করবে না। (৯) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। (১০) অন্যের দ্রব্যে লোভ করবে না।

মোজেসের মৃত্যুর পর ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে গিয়ে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছিল। আচার-ব্যবহার ও ধর্মমতের দিক দিয়ে ইহুদীরা অন্য সকলের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে মনে করে।

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন:

১। ব্যাবিলন কাদের রাজধানী ছিল?
২। ব্যাবিলনবাসীরা কাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল?
৩। মেসোপটেমিয়ার প্রধান সম্পদ্ কি ছিল?
৪। ব্যাবিলনের লোকদের সঙ্গে কোন্ কোন্ দেশের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল?

৫। ব্যাবিলনবাসীদের তৈরি কোন্ কোন্ জিনিস বিখ্যাত ছিল?
৬। ব্যাবিলনের নগর-দেবতার নাম কি ছিল?
৭। ব্যাবিলনের দেবীদের মধ্যে প্রধান কে ছিলেন?
৮। ব্যাবিলনবাসীরা কিভাবে লিখত?
৯। ব্যাবিলনবাসীরা কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিল?
১০। কোন্ বীরের কাহিনী নিয়ে ব্যাবিলনীয় ভাষায় মহাকাব্য রচিত হয়েছিল?
১১। পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় কোথায়?
১২। ব্যাবিলনের একজন নামকরা রাজার নাম কর।
১৩। হামুরাবির নাম ইতিহাসে কেন বিখ্যাত?
১৪। হামুরাবি ব্যাবিলনের অধিবাসীদের কয়ভাবে ভাগ করেছেন এবং কি কি?
১৫। হামুরাবি-প্রণীত আইনের মূল নীতি কি ছিল?
১৬। মেষপালক রাজা কাদের বলা হয়?
১৭। হিকসোজ্‌দের কে কিভাবে তাড়িয়ে দেন?
১৮। মিশরবাসীদের সর্বাপেক্ষা সফল রাজা কে ছিলেন?
১৯। আহ্‌মোজবংশের রাজধানী কোথায় ছিল?
২০। আখিনাটন কে? তিনি কি প্রচার করেন?
২১। আখিনাটনের উপাস্য দেবতার নাম কি?
২২। কারা আর্য নামে পরিচিত?
২৩। আর্যদের প্রথম কত বছর আগে কোথায় দেখা যায়?
২৪। 'পারস্য উপসাগর' এই নামটি হয়েছে কেন?
২৫। পারসিকদের একজন পরাক্রান্ত রাজার নাম কর।
২৬। ক্যামবাইসিস কে?
২৭। পারসিক সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন?
২৮। ভারতবর্ষের লোকেরা তাঁকে কর হিসেবে কি দিত?
২৯। দারায়ুসের বীরত্ব কাহিনী কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?
৩০। দারায়ুসের বীরত্বের একটি খোদাই করা চিত্রের বর্ণনা দাও।
৩১। জার্কসিজ্ কে ছিলেন?
৩২। পারসিকদের মধ্যে একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের নাম কর।
৩৩। আবেস্তা কি?
৩৪। পারসিক সম্প্রদায়ের লোক ভারতের কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?
৩৫। ওল্ড টেস্টামেণ্ট কাকে বলে?
৩৬। ইহুদীদের নেতার নাম কি ছিল?

৩৭। রামেসিস্ কে ছিলেন ?

৩৮। ইহুদীদের ধর্মগুরুর নাম কি ছিল ?

৩৯। এব্রাহামের সন্তানসন্ততিরা কোথায় স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ব্যাবিলনের সভ্যতা বলতে কি বোঝ ?

২। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য ব্যাবিলনবাসীরা কি ব্যবস্থা করেছিল ?

৩। কৃষির উন্নতির জন্য ব্যাবিলনীয়রা কি চেষ্টা করেছিল ?

৪। ব্যাবিলনীয় সমাজে পুরোহিতদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেমন ছিল ?

৫। বিদ্যাচর্চার জন্য ব্যাবিলনবাসীরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে ?

৬। ব্যাবিলনের পণ্ডিতরা কোন্ বীরের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন ?

৭। পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারে কি ছিল ?

৮। হামুরাবি কতদূর রাজ্যবিস্তার করেছিলেন ?

৯। পৃথিবীর প্রথম আইন-প্রণেতারূপে হামুরাবির পরিচয় দাও।

১০। হামুরাবির সময়ে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের বিচারব্যবস্থা কেমন ছিল ?

১১। হামুরাবি-সংকলিত একটি প্রশংসনীয় আইনের নাম কর।

১২। হিকসোজ্রা কিভাবে মিশর জয় করেছিল ?

১৩। মিশরের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ শুরু হয় কবে ?

১৪। তৃতীয় থাটমোজ্ কতদূর তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন ?

১৫। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে থাটমোজ্ কি নীতি গ্রহণ করেন ?

১৬। মিশরীয় রাজারা আমনকে এত শ্রদ্ধা করত কেন ?

১৭। সাইরাস কে ? তিনি কতদূর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

১৮। জরথুস্ট্র কে ? তিনি কোন্ নতুন ধর্মমতের প্রচার করেন ?

১৯। পারসিকরা কি অগ্নির উপাসক ?

২০। রামেসিস ইহুদীদের ওপর কিরূপ অত্যাচার করতেন ?

২১। মোজেস্ কিভাবে লালিত-পালিত হন ?

২২। মোজেস্ ফেরোর দাসত্ব থেকে কিভাবে ইহুদীদের মুক্ত করেন ?

২৩। মোজেস্ ইহুদীদের যে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি কি কি ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। হামুরাবি কে ছিলেন ? হামুরাবির আইন-সংহিতা সম্বন্ধে কি জান ?

২। মিশরীয়দের সমাজে পুরোহিতদের ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায় ? কে এই ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন ?

৩। পারসিক সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? কারা এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন ?

৪। ইহুদীদের মিশরে আগমন সম্বন্ধে বাইবেলের কাহিনী বর্ণনা কর।

৫। ইহুদীদের ধর্মগুরু কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ঠিকমতো সাজিয়ে লেখ :

(১) নগরের দেবতা মারডুক	(১) হামুরাবি।
(২) মেসোপটেমিয়ার প্রধান সম্পদ্ ছিল	(২) ইস্টার।
(৩) ব্যাবিলনবাসীদের দেবীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন	(৩) কৃষি।
(৪) ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে নামকরা রাজা ছিলেন	(৪) সেচব্যবস্থা আবিষ্কার করেন।
(৫) থিবস নগরের রাজা ছিলেন	(৫) দারায়ুস।
(৬) পারসিক বিখ্যাত রাজা ছিলেন	(৬) আহ্‌মোজ।

সঠিক উত্তরের পাশে 'হ্যাঁ' লিখ :

(ক) পারসিকদের মধ্যে একজন মহাজ্ঞানী পুরুষের নাম হামুরাবি।

(খ) জরথুস্ট্রের উপদেশসমূহ আবেস্তা নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(গ) ব্যাবিলনীয়রা গণিতে খুবই দক্ষ ছিল।

(ঘ) হিকসোজ্ নামে এক জাতি এশিয়া থেকে এসে মিশর জয় করে।

(ঙ) পারসিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্তমান মাদ্রাজ অঞ্চলে বাস করে।

(চ) সাইরাসের ছেলের নাম ক্যাম্বাইসিস।

(ছ) রামেসিস ছিলেন এক দেবতা।

(জ) ব্যাবিলনের একটি শহরের নাম ছিল উর।

কোন্ উত্তরটি ঠিক বল :

(ক) বাইবেলের প্রথম অংশের নাম—নিউ টেস্টামেণ্ট/গ্রন্থ সাহেব/ওল্ড টেস্টামেণ্ট।

(খ) ইহুদীদের ধর্মগুরুর নাম—ক্যাম্বাইসিস/রামেসিস/মোজেস্।

(গ) দারায়ুসের পুত্রের নাম—সাইরাস/জার্কসিস/জরথুস্ট্র।

(ঘ) থিবসের নগর-দেবতার নাম—অ্যাটন/আমন/মারডুক।

(ঙ) হামুরাবি ব্যাবিলনের অধিবাসীদের ভাগ করেন—দুই শ্রেণীতে / তিন শ্রেণীতে/এক শ্রেণীতে।

(চ) আহ্মোজ-এর বংশধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন—:য় থাটমোজ/ হামুরাবি/সাইরাস।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

জরথুস্ট্রের মতে যা ভালো, যা সত্য, যা আলোকময় তার প্রভু হলেন — —। আর যা মন্দ, মিথ্যা এবং তমসাচ্ছন্ন তার সৃষ্টি করেন —। থিবস নগরের রাজা — হিকসোজ্দের তাড়িয়ে দেন। ব্যাবিলনবাসীরা কাদামাটির তৈরি — উপর লিখত। হামুরাবি-প্রণীত আইন ছিল চোখের বদলে —— —বদলে দাঁত। — নামে একজন ফেরো আমনের প্রধান পূজারীর ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রীকজাতির ইতিবৃত্ত

আর্যরা শুধুমাত্র পশ্চিম এশিয়া, ইরান এবং ভারতবর্ষেই আসেনি, তারা দলে দলে ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, জার্মান প্রভৃতি জাতি তাদের বংশধর। প্রাচীন গ্রীকরাই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

মিনোয়ান সভ্যতা : গ্রীকদের আগে ইউরোপে সভ্য মানুষ যে বাস করত না তা কিন্তু নয়। ইউরোপে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল ক্রীট দ্বীপে। এই দ্বীপটি গ্রীক এবং এশিয়া মাইনরের উপকূল-ঘেরা ইজিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানকার একজন পৌরাণিক রাজার নামে পণ্ডিতরা ইউরোপের এই প্রাচীনতম সভ্যতার নাম দিয়েছেন মিনোয়ান সভ্যতা।

ক্রীটের প্রাকৃতিক সম্পদ্ বিশেষ কিছু নেই বললেই হয়। তাই সাগরঘেরা ক্রীটের মানুষরা প্রথম থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে

জীবনযাপন করতো। মিশরের লোকদের কাছ থেকে তারা নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু তারা মিশরীয়দের অন্ধ অনুকরণ করতো না। তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে তারা জিনিসপত্র তৈরি করতো।

এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে এরা ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। তখনই এরা সোনা, রূপা প্রভৃতি দিয়ে যে সকল অলঙ্কার তৈরি করতো সেগুলি দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। এই থেকে প্রাচীন ক্রীটবাসীদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে এরা সভ্যতার এক অতি উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। তখন এরা নাগরিক-জীবন যাপন করত। এদের প্রধান শহরের নাম হলো ক্নোসস্ (Knossos)। সেখানে একটি বিরাট প্রাসাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর দেওয়ালগুলি ছিল নিপুণ চিত্রকরদের আঁকা বহুবর্ণের চিত্রে সজ্জিত। মাটির নীচে প্রাসাদের যে অংশটি ছিল সেখানে বড়ো বড়ো জালা-ভরা বাণিজ্যের মালপত্র রাখা হতো। প্রাসাদের মধ্যে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছিলো। সেখানে রাজা নানারকম আমোদ-আহ্লাদের অনুষ্ঠান করতেন। এই সময় ক্রীটবাসীরা লিখতেও শিখেছিল।

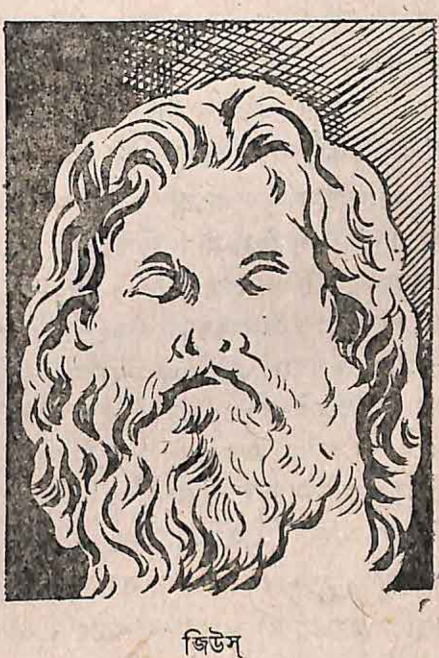
ক্রীটের বণিক রাজারা ইজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপমালায়, দক্ষিণ গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের উপকূলে অনেকগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, সেখানে তারাই কর্তৃত্ব করতো। এইভাবে ক্রীটবাসীরা একটি সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। এদের কাছ থেকে ইজিয়ান্ জগতের মানুষরা মিনোয়ান্ ভাবধারা এবং শিল্পকলায় দীক্ষালাভ করে।

মাইসিনির সভ্যতা : দক্ষিণ গ্রীসের মাইসিনি শহর ক্রীটবাসীদের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো। সেখানকার লোকেরা একসময় খুব পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। তারা ক্নোসস্ শহরটি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্রীটসাম্রাজ্যের অবসান হয়।

এখন জানা গেছে যে, মাইসিনিতে তখন যারা বাস করতো, তারা গ্রীক ভাষায় কথা বলতো। অন্য ভাষায় কথা বললেও এরা মিনোয়ান্ লিপি গ্রহণ করেছিল। শিল্পকলায়ও এরা মিনোয়ান্-রীতি অনুসরণ করে। এদের রাজারাও বড়ো বড়ো প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাঁরাও প্রচুর ধনরত্নের মালিক হন। এইভাবে তাঁরা মিনোয়ান্ সভ্যতা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু গ্রীক

জাতির আর একটি শাখা উত্তর দিক থেকে গ্রীসে প্রবেশ করে মাইসিনি সভ্যতা ধ্বংস করে দেয়। এই নতুন আক্রমণকারীরাই গ্রীক-সভ্যতার আদি স্রষ্টা।

হোমারের যুগ ঃ গ্রীকদের রাজসভায় অনেক গায়ক এবং চারণকবি থাকতো। তারা বড়ো বড়ো বীরদের জয়গান করে কবিতা রচনা করতো। হোমার নামে একজন অন্ধ গ্রীক চারণকবি দু'খানি মহাকাব্য রচনা করেন। একখানির নাম 'ইলিয়াড', আর এক-খানির নাম 'ওডিসি'। কি করে গ্রীকদেশের বীররা সকলে একত্র হয়ে এশিয়া মাইনরের উপকূলে অবস্থিত ট্রয় শহরটি ধ্বংস করেছিল, ইলিয়াড থেকে সেই বীরত্বের কাহিনী জানা যায়। আর কি করে মহাবীর ওডিসিউস্ ট্রয় থেকে ফেরার সময় নানা রকম বিপদ-আপদ কাটিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন তাই হলো ওডিসির আসল কথা। ইলিয়াড ও ওডিসিতে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আছে তা হলো মিনোয়ান সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী।



জিউস্

হোমারের মহা-কাব্য দু'খানি থেকে জানা যায় যে, যে গ্রীকরা মাইসিনি ধ্বংস করেছিল, তারা লিখতে জানতো না। নাগরিক জীবনের সঙ্গেও তারা পরিচিত ছিলো না। প্রথমে তারা গ্রামে বাস করতো এবং চাষবাস ও পশুপালন করে জীবনধারণ করতো। কিন্তু পরে তারা শহরেরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। এক একটি শহর ও তার আশপাশের

এলাকা নিয়ে ক্রমে এক-একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। এরা সব সময়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করতো।

সেকালের গ্রীক রাজারা ছিলেন একাধারে পুরোহিত, প্রধান বিচারক এবং সেনাপতি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সভা ছিলো। রাজাদের এই সভার মত নিয়ে কাজ করতে হতো।

গ্রীকদের এই আদি কাব্য দু'খানি থেকে তাদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। গ্রীস্ দেশের উত্তরে অলিম্পাস্ নামে একটি বিশাল পর্বত আছে। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা এই পর্বতের উপর বাস করেন। দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস্ আর রানী হেরা। গ্রীকরা জ্ঞানের দেবী অ্যাথিনী এবং সূর্যের দেবতা অ্যাপোলোকে খুব ভক্তি করতো।

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র: গ্রীস দেশটি পাহাড়-পর্বতে পরিপূর্ণ। সেকালে তারই ছোটো ছোটো উপত্যকায় এক-একটি শহরকে কেন্দ্র করে ছোটো-ছোটো রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে মেলা-মেশার তেমন সুযোগ ছিলো না। প্রত্যেকটি শহরের লোক অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল। সেইজন্য এখানে মিশর বা ব্যাবিলনের মতো কোনো বড়ো রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। গ্রীসের রাজ্যগুলির মধ্যে এথেন্স্, স্পার্টা, করিন্থ এবং থিবস্ই ছিল বিশেষ শক্তিশালী।

সাংস্কৃতিক যোগাযোগ: রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রীকদের মধ্যে কোনো একতা ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল। গ্রীকরা মনে করতো যে, তারা একই পূর্ব-পুরুষের বংশধর। তাদের ভাষাও ছিল এক। হোমারের কাব্য দু'খানিকে তারা আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের মত জাতীয় গ্রন্থ বলে মানতো। প্রত্যেকটি রাজসভায় এই গ্রন্থ দু'খানি থেকে আবৃত্তি করে শোনানো হতো। গ্রীকদের মধ্যে মেলা-মেশা যে একেবারেই হতো না তা নয়। দক্ষিণ গ্রীসের পশ্চিম প্রান্তে অলিম্পিক শহরে দেবরাজ জিউসের একটি বিখ্যাত মন্দির ছিলো। প্রতি চার বছর অন্তর সেখানে নানারকম খেলাধুলা হতো। গ্রীসের সব জায়গার লোক এখানে এসে জড়ো হতো এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতো। নানা রাজ্য থেকে সাহিত্যিকরাও আসতেন। তাঁরা তাঁদের নতুন নতুন লেখা পড়ে

শোনাতেন। এইভাবে খেলাধুলার সাথে গ্রীকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও চলতো।

উপনিবেশ-স্থাপন ঃ গ্রীকদের মধ্যে এক সময় রাজার সমস্ত ক্ষমতা খর্ব করে অভিজাত পরিবারের লোকেরা সকল ক্ষমতা দখল করেন। ক্রমে তাঁরাই হলেন সকল জমিজমার মালিক। অনেক সাধারণ লোক দেনার দায়ে তাদের জমিজমা বিক্রি করে দেয়, আবার অনেকে কোনো রকমেই দেনা শোধ করতে না পেরে নিজেদেরই বিক্রি করে ক্রীতদাস হয়। এই সময় গ্রীসের অনেক লোক দেশ ছেড়ে অন্যত্র জমিজমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। বিদেশে গিয়ে তারা স্থায়িভাবে বসবাস করতো। এইভাবে দেশের বাইরে উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। আবার অনেক লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য স্থায়িভাবে বিদেশে চলে যায়। তখন উপনিবেশের সংখ্যা আরোও বাড়ে। ক্রমে এমন হলো যে, ইজিয়ান্ সাগরের সব দ্বীপগুলিতে, এশিয়া মাইনরের উপকূলে, কশ্যপ হ্রদের তীরে, দক্ষিণ ইটালিতে এবং সিসিলি দ্বীপে গ্রীকদের নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে। এই শহরগুলি প্রত্যেকটি ছিল স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। একমাত্র সাংস্কৃতিক বিষয় ছাড়া তাদের স্বদেশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এথেন্স ও স্পার্টার জীবনযাত্রা ঃ গ্রীসের শহরগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী। এথেন্সের আদর্শ ছিল সুস্থ ও শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা। ছেলেরা সাধারণত নিজ নিজ গৃহে শিক্ষালাভ করতো। কোনো কোনো শিক্ষক নিজেদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ছেলেদের ইতিহাস, সঙ্গীত এবং ছবি আঁকবার সাথে সাথে ব্যায়াম করতেও শেখানো হতো। মেয়েরা ঘর-কন্নার কাজ করতো। সুতো কাটা, কাপড় বোনা, সূঁচের কাজ, গান-বাজনা এইসব ছিল তাদের শিক্ষার অঙ্গ।

ষোলো বছর হলে ছেলেরা শরীর-চর্চার দিকে বেশি নজর দিতো। এর দু'বছর পর তাদের নাগরিকের কর্তব্য এবং যুদ্ধবিদ্যা শেখানো হতো। তেইশ বছর বয়সে তারা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করবার অধিকারী হতো। এথেন্সে শুধু গণ্যমান্য লোকেরাই নয়, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সকল শ্রেণীর নাগরিক একত্র হয়ে দেশ শাসন করতো।

স্পার্টানদের আদর্শ ছিল কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তারা চাইতো নিজেদের বীরের জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে। এইজন্য তাদের শিক্ষা-পদ্ধতিও ছিল খুব কঠোর। স্পার্টায় জন্ম হবার পরেই শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা হতো সে সুস্থ এবং নীরোগ কি না। অসুস্থ এবং বিকলাঙ্গ শিশুদের মেরে ফেলা হতো। শিশুরা সাত বছর পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকতো। তারপরে রাজ্যের শাসনকর্তারা তাদের শিক্ষার ভার নিতেন। তাদের দেহ যাতে সবল হয়, তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আর শারীরিক কষ্ট সহ্য করে যাতে প্রকৃত যোদ্ধা হতে পারে, কেবলমাত্র সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হতো। লেখাপড়া, গানবাজনা বা কোনোরকম শৌখিনতাকে উৎসাহ দেওয়া হত না।

তিরিশ বছর বয়সে স্পার্টান যুবকেরা বিয়ে করবার অনুমতি পেত। কিন্তু তাদের সৈন্য-শিবিরে থাকতে হতো। ষাট বছর বয়স হলে তারা বাড়িতে থাকবার অনুমতি পেতো। এই রকম কঠোর জীবনযাপন করে স্পার্টানরা খুব দক্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল, আর তাদের বীরত্বের খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্পার্টায় দুজন রাজা ছিলেন। কিন্তু আসল রাজকার্য চালাতেন অভিজাত পরিবারের বৃদ্ধরা। রাজারা শুধু যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। সেখানকার সাধারণ লোকের কোনোরকম অধিকারই ছিল না। সেইজন্য তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিতো।

এথেন্স ও স্পার্টানদের মধ্যে সংঘর্ষ : পারসিকরা যখন গ্রীস আক্রমণ করে তখন গ্রীকরা রণনিপুণ স্পার্টানদের নেতৃত্বের পদে বরণ করেছিল। কিন্তু তাদের কাছ থেকে যে রকম সাহায্য আশা করা গিয়েছিল তা পাওয়া গেলো না। এথেন্সের উপর দারায়ুসের বিশেষ রাগ ছিল। তার কারণ এথেন্সবাসীরা পারসিক সাম্রাজ্যের একটি শহর পুড়িয়ে দেয়। দারায়ুসের সৈন্যরা জাহাজে করে এথেন্সের কিছু দূরে ম্যারাথনের প্রান্তরে এসে নামে। স্পার্টায় তখন এক ধর্মোৎসব চলছিল। তাই স্পার্টানরা তখনই আসতে পারলো না। কিন্তু মুষ্টিমেয় এথেন্সবাসী পারসিক বাহিনীকে হারিয়ে দিয়ে ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়লাভ করে। এরপরে যখন জার্কসিজ্ হাজার হাজার সৈন্য নিয়েগ্রীস আক্রমণ করেন তখনস্পার্টার রাজা লিওনিডাস্

মাত্র তিন শ' স্পার্টান সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেন। তাদের সাহায্যের জন্য আর মাত্র সাত হাজার গ্রীক সৈন্য ছিল। তাই গ্রীকরা হেরে গেল। জার্কসিজ্ সসৈন্যে এথেন্সে এসে শহরটি পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন। কিন্তু পারসিকদের জয় স্থায়ী হলো না। গ্রীকরা স্যালামিসের নৌযুদ্ধে পারসিকদের বিরুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করল। এর ফলে জার্কসিজ্ খুবই দমে গেলেন। তিনি অর্ধেক সৈন্য গ্রীসে রেখে বাকি অর্ধেক নিয়ে দেশে ফিরলেন। গ্রীকরা তখন বিপুল বিক্রমে বাকি শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করে পরাজিত করল। স্যালামিসের যুদ্ধের ফলেই সমস্ত গ্রীসদেশ পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা পেল।

পারসিকরা বিতাড়িত হলে স্পার্টানরা ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু এথেন্সবাসীরা তা করল না। এশিয়া মাইনর ও ইজিয়ান সাগরের উপনিবেশগুলি পারসিকদের অধীনে ছিল। এদের মুক্ত করবার জন্য এথেন্সের নেতারা যুদ্ধ চালিয়ে যান। এই সকল স্থান থেকেও পারসিকদের সরে যেতে হলো।



পেরিক্লিস্

পারসিকদের পরাজয়ের পর একটানা পঞ্চাশ বছর ধরে এথেন্সই ছিল গ্রীসের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। আর তখন এথেন্সের সর্বপ্রধান রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন পেরিক্লিস্। তাঁর সময়ে এশিয়া মাইনর ও ইজিয়ান্ সাগরের গ্রীক রাষ্ট্রগুলির উপর এথেন্সের পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে স্পার্টানদের মনে দারুণ ক্ষোভ ও ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তারপর এক সময়ে গ্রীসের এই দুটি প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ প্রায় তিরিশ বছর ধরে চলেছিল। এর ফলে এথেন্সের প্রাধান্য সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে আবার স্পার্টার প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব : পেরিক্লিস্ কিন্তু সাম্রাজ্য গঠন করে যশ অর্জন করেননি। তিনি এথেন্সকে গ্রীকদের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিলেন। এই সময়ে সেখানে বড় বড় নাট্যকার, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ভাস্করের সমাবেশ হয়েছিল। তাই পেরিক্লিসের যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সাহিত্য : গ্রীক নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন এস্কাইলাস, সফোক্লিস্, ইউরিপিডিস ও অ্যারিস্টোফেনিস্। এঁরা সকলেই এথেন্সের অধিবাসী ছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী ও নিজেদের সময়ের ঘটনা ও লোকজনদের নিয়ে এঁরা নাটক লিখতেন। এই সকল নাটক পড়ে এবং অভিনয় দেখে এথেন্সবাসীরা মুগ্ধ হয়ে যেত।



হেরোডোটাস্

গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হেরোডোটাসের। তাঁর দেশ ছিল এশিয়া মাইনরে। সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি কিছুদিন এথেন্সে বাস করেছিলেন। প্রচলিত গল্প, শিলালিপি এবং অন্য লোকের লেখা বই ইত্যাদি যোগাড় করে তিনি তাঁর ইতিহাসখানি লেখেন। এর আগে কেউ এমনভাবে ইতিহাস লেখেননি। তাই তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন থুসিডিডিস্। তিনি এথেন্সের নাগরিক ছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ। তাঁর ইতিহাসে তিনি স্বদেশবাসীদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখাননি, যা প্রকৃত ঘটনা তা-ই তিনি বর্ণনা করেছেন।

গ্রীকদের মধ্যে তিনজন বড় বড় দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল। তাঁরা হলেন **সক্রেটিস্, প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল**। সক্রেটিস্ ছিলেন জ্ঞানের সাগর। এথেন্সের রাস্তায় ও বাজারে যখনই যার সঙ্গে দেখা হতো তার সঙ্গেই তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি সকলকে বলতেন, "জ্ঞান অর্জন কর এবং নিজেকে ভাল করে জান।" তখন

সমাজে এবং প্রচলিত ধর্মে যে সব দোষত্রুটি ছিল সেগুলি তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। এতে একদল লোক তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়। তারা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো যে, তিনি দেবতাদের অসম্মান করছেন এবং যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন। বিচারে সক্রেটিস্‌কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। জীবনের শেষ সময়েও তিনি শিষ্যদের সঙ্গে আগের মতই আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে তিনি হাসিমুখে বিষপান করে মৃত্যুকে বরণ করেন।



সক্রেটিস্‌

সক্রেটিসের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন প্লেটো। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো গুরুর উপদেশগুলি লিখে প্রচার করেন। কিভাবে চিন্তা করা উচিত, শাসনপদ্ধতি কেমন হলে ভাল হয়—এমনি নানা বিষয় নিয়ে তিনি নিজেও অনেক নতুন নতুন বই লেখেন।

অ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসী। প্লেটোর কাছে শিক্ষালাভ করার জন্য তিনি এথেন্সে আসেন। অ্যারিস্টট্‌লের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তখনকার দিনে এমন কোন বিষয় ছিল না যার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি বা লিখে যাননি। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি ভাল করে বিচার করতেন, তাই তাঁকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার স্রষ্টা বলা হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : এর আগে আমরা বলেছি যে, পারসিক সম্রাট জার্কসিজ এথেন্স শহর পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। পেরিক্লিস্ সেই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার একটি নতুন শহর গড়ে তোলেন।

তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি **ইকটিনাস্** ও ভাস্কর **ফিডিয়াসের** উপর এই শহরের শোভা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবার ভার পড়ে। এই দুজন শিল্পীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল **পার্থিনন্**। এটি হলো এথেন্সের নগর-দেবী 'অ্যাথিনা'র মন্দির। মন্দিরটি আগাগোড়া মার্বেল পাথরে গড়া। ফিডিয়াস অ্যাথিনার দুটি মূর্তি গড়েছিলেন। একটি তৈরি করেছিলেন সোনা আর হাতির দাঁত দিয়ে; অন্যটি ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি, প্রায় সত্তর ফুট উঁচু। এথেন্সবাসীরা দূর থেকে এই মূর্তিটি দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করত। এথেন্সের আর একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন **প্রাক্‌সিটিলিস্**। তিনিও খুব সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়তে পারতেন।

এথেন্সবাসীদের ধর্মাচরণ : গ্রীকরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করতো তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পেরিক্লিসের সময় থেকে এথেন্সবাসীরা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা-অর্চনা করত। মেয়ে-পুরুষ মিছিল করে নানা রকম জিনিসপত্র নিয়ে মন্দিরে যেতো। নাচ-গান, খেলা-ধুলা পূজার অঙ্গ ছিল। তাছাড়া এই সময় অভিনয়ও হতো।

গ্রীসের যা কিছু সুন্দর এবং যা কিছু মহান্ তার অধিকাংশই সৃষ্টি করেছিল এথেন্সের লোক। পেরিক্লিস্ গর্ব করে বলেছিলেন, এথেন্স হলো সমস্ত গ্রীসের বিদ্যায়তন। এই রকম গর্ব করবার অধিকার তাঁর ছিল।

ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের কাহিনী : পারসিকদের আক্রমণের প্রায় দেড়শ বছর পরে গ্রীকদের মধ্যে এক দিগ্বিজয়ী বীরের জন্ম হয়েছিল। তাঁর অপূর্ব কার্যকলাপের জন্য তিনি ইতিহাসে মহামতি আলেকজাণ্ডার বলে পরিচিত।

সেকালে উত্তর গ্রীসে ম্যাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ ছিলেন সেখানকার রাজা। তিনি একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী গঠন করে ম্যাসিডনকে খুব শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এই সময় গ্রীকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে ফিলিপ সমস্ত গ্রীস দেশটিকে জয় করেন।

পুত্র আলেকজাণ্ডার যাতে সব দিক দিয়ে সুশিক্ষিত হতে পারেন সেই জন্য ফিলিপ খুব ভাল ব্যবস্থা করলেন। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অ্যারিস্টট্‌লকে ডেকে তিনি তাঁর উপর পুত্রের শিক্ষার ভার দেন। গুরুর কাছ থেকে আলেকজাণ্ডার নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। হোমারের কাব্য দু'খানি তাঁর খুব ভাল লাগত। তিনি প্রাচীনকালের গ্রীক বীরদের কথা পড়তেন আর তাঁদের মত বীর হবার কথা চিন্তা করতেন। এজন্য তিনি খুব চেষ্টাও করতে লাগলেন। অসি চালনা, অশ্বচালনা, মল্ল-ক্রীড়া—এই সকল বিষয়ে তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

পারস্য সাম্রাজ্য জয়ঃ আলেকজাণ্ডারের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন একজন গুপ্ত ঘাতকের হাতে ফিলিপের মৃত্যু হয়। আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, গ্রীক সভ্যতা বিস্তার করে তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার মিলন ঘটাবেন। রাজা হবার দু'বছর পরে আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ইউরোপের সীমানা পার হয়ে তিনি প্রথমে এশিয়া মাইনরের কয়েকটি শহর দখল করেন। তারপরে একে একে সিরিয়া, টাইর, সাইডন, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি রাজ্য তাঁর অধীন হলো। পারসিক সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দু'বার আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দু'বারই তাঁর পরাজয় হয়।

ভারত-অভিযানঃ পারসিক সাম্রাজ্য জয় করে আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। অনেকেই বিনা যুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন। আবার কেউ কেউ স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন।

সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যে তক্ষশীলা নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারকে স্বাগত জানান এবং খাবার-দাবার ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন। অম্ভির প্রতিবেশী রাজা ছিলেন পুরু। আলেকজাণ্ডার পুরুকে বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য বলে পাঠালেন। কিন্তু পুরু ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

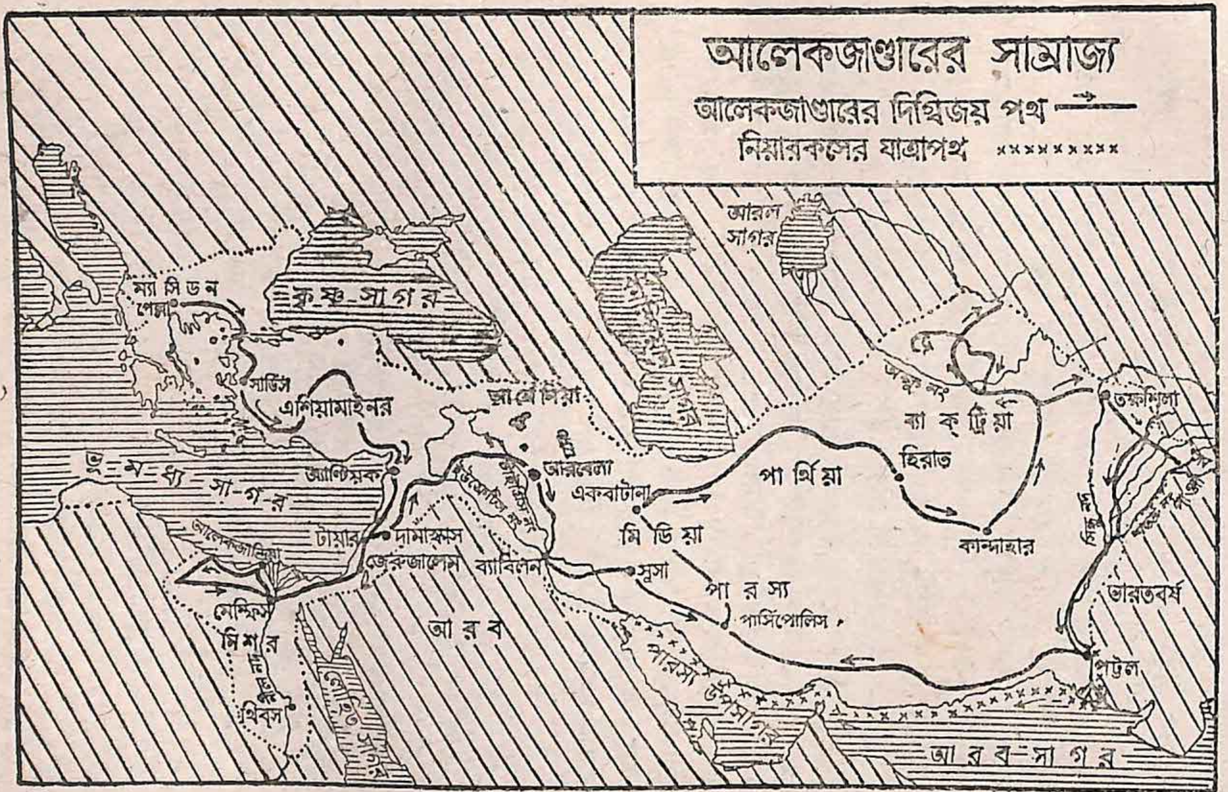
করলেন। তখন দু' পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধে। পুরুর অনেকগুলি হাতি ছিল। গ্রীকরা চারদিক থেকে এই বড় বড় জন্তুগুলির উপর অস্ত্র-শস্ত্র ছুঁড়তে আরম্ভ করল। হাতিগুলি ক্ষেপে গিয়ে শত্রু-মিত্র সকলকেই পিষে মারতে লাগল। এর ফলে পুরুর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। পুরু শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন। কিন্তু তিনি নিজের মর্যাদা ভুললেন না। আলেকজাণ্ডার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করো?" পুরু সগর্বে উত্তর করলেন, "রাজার মতো।" আলেকজাণ্ডার তাঁর তেজস্বিতায় মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁকে মুক্তি তো দিলেনই, তাঁর রাজ্যও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। আলেকজাণ্ডার বীরকে সম্মান দিতে জানতেন।



আলেকজাণ্ডার

এরপরে আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীর ওপারেই ছিল মগধের নন্দবংশের রাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য। আলেকজাণ্ডার জানতে পারলেন যে, নন্দরাজ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং বহু হাতি নিয়ে তাঁকে বাধা দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু গ্রীক সৈন্যরা আর কিছুতেই এগোতে চাইল না। আলেকজাণ্ডার শত চেষ্টা করেও তাদের মত পরিবর্তন করাতে পারলেন না। তাঁকে ফিরে যেতে হলো।

আলেকজাণ্ডার যে-পথে এসেছিলেন সে পথে ফিরলেন না। ঝিলাম নদীর তীরে ফিরে এসে তিনি দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। পথে পাঞ্জাবের কয়েকটি শক্তিশালী জাতি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। তাদের সকলকেই পরাজিত করে তিনি ক্রমে সিন্ধু নদের মোহনার কাছে এসে পড়লেন। সেখান থেকে তিনি বালুচিস্তানের


আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য
আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় পথ
নিয়ারকসের যাত্রাপথ ×××××××××
ম্যাসিডন
পেলা
কৃষ্ণসাগর
সার্ডিস
এশিয়ামাইনর
আর্মেনিয়া
আরবেলা
আন্টিয়ক
ভূমধ্যসাগর
টায়ার
দামাস্কাস
জেরুজালেম
ব্যাবিলন
আলেকজান্দ্রিয়া
মেম্ফিস
মিশর
থিবস
আরব
সুসা
পারস্য
পার্সিপোলিস
পারস্য উপসাগর
একবাটানা
মিডিয়া
পার্থিয়া
হিরাত
কান্দাহার
ব্যাকট্রিয়া
আরল সাগর
তক্ষশিলা
ভারতবর্ষ
পট্টল
আরবসাগর

ভিতর দিয়ে ব্যাবিলনে ফিরে গেলেন। তারপর তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়। মিশর ও পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীকসভ্যতা বিস্তার করেই আলেকজাণ্ডার সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে গ্রীক সেনাপতিদের মধ্যে অনেক দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। ক্রমে সেখানে তিনটি স্বাধীন গ্রীকরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল—ম্যাসিডন, মিশর ও সিরিয়া। সিরিয়ার রাজা **সেলিউকস**-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করেন।

খাস গ্রীস্ অনেক কাল ম্যাসিডনের অধিকারে ছিল। তারপর এক সময়ে রোমানদের সঙ্গে ম্যাসিডনের রাজার তিনবার যুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ফ্লামিনিনাস্ নামে একজন রোমান সেনাপতি গ্রীক শহরগুলিকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু গ্রীকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির বিরাম ছিল না। এদের মধ্যে কয়েকটি শহর একত্র হয়ে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তখন রোমানরা এই বিদ্রোহ দমন করে গ্রীসে নিজেদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আঃ ২৮০০-১০০০ মিনোয়ান সভ্যতার যুগ
" " ১৪৫০-১২০০ মাইসিনিয়ান্ সভ্যতার উন্মেষ
" " ১৪০০ ক্নোসাস্ শহরের পতন
" " ১১৯৪-১১৮৪ ট্রয় শহরের অবরোধ ও ধ্বংস
" " ১০০০ উত্তর হতে নতুন গ্রীক আক্রমণকারীদের আগমন
" নবম শতাব্দী—হোমার
" ৭৭৬—প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া
" ৪৬২-৪২৮—পেরিক্লিসের যুগ
" ৩৯৯—সক্রেটিসের বিষপানে মৃত্যু
" ৩৩৬—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন লাভ
" ৩৩১—পারসিক সাম্রাজ্যের পতন
" ৩২৭-৩২৫—আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান
" ৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কারা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ?
২। ইউরোপে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল কোথায় ?
৩। মিনোয়ান সভ্যতা নাম হয়েছে কেন ?
৪। ক্রীটবাসীদের প্রধান শহরের কি নাম ছিল ?
৫। ক্রীটবাসীদের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম কর।
৬। ক্রীট সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয় কিভাবে ?
৭। হোমার-লিখিত দুইখানি মহাকাব্যের নাম লেখ।
৮। গ্রীসদেশের উত্তরে একটি বিশাল পর্বতের নাম লেখ।
৯। গ্রীসের কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের নাম কর।
১০। কত বছর বয়সে এথেন্সবাসীরা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করত ?
১১। স্পার্টায় কয়জন রাজা ছিলেন ?
১২। পেরিক্লিস কে ছিলেন ?
১৩। কোন্ যুগকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলে ?
১৪। কয়েকজন গ্রীক ঐতিহাসিকের নাম কর।
১৫। একজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক ঐতিহাসিকের নাম কর।
১৬। এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের নাম কি ?
১৭। তিনি কি বিষয়ের উপর বই লেখেন ?
১৮। গ্রীকদের মধ্যে তিনজন বড় দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল ; তাঁদের নাম বল।
১৯। সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য কে ছিলেন ?
২০। অ্যারিস্টট্ল কোথাকার অধিবাসী ছিলেন ?
২১। এথেন্সের নগর-দেবীর নাম কি ?
২২। পার্থিনন কি ?
২৩। এথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করের নাম কি ?
২৪। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন ?
২৫। আলেকজাণ্ডারের পিতার নাম কি ছিল ? তিনি কোথাকার রাজা ছিলেন ?
২৬। আলেকজাণ্ডারের শিক্ষার জন্য ফিলিপ কি ব্যবস্থা করেন ?
২৭। ফিলিপ কিভাবে নিহত হন ?
২৮। আলেকজাণ্ডার প্রথমে কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেন ?
২৯। তক্ষশীলা কোথায় অবস্থিত ছিল ?

৩০। তক্ষশীলার রাজার নাম কি ছিল ?

৩১। আলেকজাণ্ডার পুরুকে কি জিজ্ঞাসা করেন ?

৩২। আলেকজাণ্ডার কোথায় মারা যান ?

কোন্‌টা ঠিক বল :—

(১) পেরিক্লিসের যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়—রোমের/এথেন্সের/ইংলণ্ডের।

(২) হোমার লিখিত একখানি মহাকাব্যের নাম—লা মিজারেবল/ওল্ড টেস্টামেণ্ট/ওডিসি।

(৩) গ্রীকদের জ্ঞানের দেবী ছিলেন—অ্যাথিনি/জিউস/জরথুস্ট্র।

(৪) "জ্ঞান অর্জন কর এবং নিজেকে ভাল করে জান", একথা বলেছিলেন —প্লেটো/অ্যারিস্টট্‌ল/সক্রেটিস।

(৫) এথেন্সের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের নাম—পেরিক্লিস/প্রাকসিটিলিস/ফিলিপ।

(৬) আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সিরিয়ার রাজা হন—প্রাকসিটিলিস/সেলুকস/ফ্লামিনিনাস্‌।

শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(১) —কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। গ্রীসদেশের উত্তরে — নামে এক পর্বত আছে। গ্রীক দেবতাদের রানীর নাম —। গ্রীকরা জ্ঞানের দেবী — এবং সূর্যের দেবতা — কে খুব ভক্তি করত। গ্রীসের রাজ্যগুলির মধ্যে —, —, —, — ছিল বিশেষ শক্তিশালী। এথেন্সের সর্বপ্রধান রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন —। — যুগকে — স্বর্ণযুগ বলা হয়। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন —। অ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন — অধিবাসী।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ক্রীট দ্বীপ কোথায় অবস্থিত ছিল ? এখানকার লোকদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?

২। মিনোয়ান্‌ সভ্যতাকে কে কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল ?

৩। ইলিয়াড ও ওডিসির বিষয়বস্তু কি ছিল ?

৪। হোমারের মহাকাব্য থেকে কি জানা যায় ?

৫। ইলিয়াড ও ওডিসি থেকে গ্রীকদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে কি জানা গেছে ?

৬। ব্যাবিলনের মত কোন বড় রাজ্য গ্রীসে গড়ে ওঠেনি কেন ?

৭। গ্রীকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ?

৮। গ্রীসে কিভাবে উপনিবেশ গড়ে ওঠে ?
৯। এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?
১০। স্পার্টানরা কিভাবে তাদের নাগরিকদের শিক্ষা দিত ?
১১। সক্রেটিস কিভাবে লোকদের শিক্ষা দিতেন ?
১২। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল ? এর ফল কি হয়েছিল ?
১৩। প্লেটো কে ? তাঁর কৃতিত্ব কি ছিল ?
১৪। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার স্রষ্টা কাকে বলা হয় ?
১৫। অ্যাথিনার মন্দির কে তৈরি করেন ? এই মন্দিরের বর্ণনা দাও।
১৬। এথেন্সবাসীদের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে কি জান ?
১৭। ফিলিপ কে ? তিনি কিভাবে গ্রীসদেশ জয় করেন ?
১৮। ফিলিপ পুত্রের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করেন ?
১৯। ভারতে আসার আগে আলেকজাণ্ডার কোন্ কোন্ দেশ জয় করেন ?
২০। রোমানরা কিভাবে সমগ্র গ্রীসে আধিপত্য বিস্তার করে ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মিনোয়ান সভ্যতা কাকে বলে ? এই সভ্যতায় লোকেরা কিভাবে জীবনযাপন করত ?
২। হোমারের মহাকাব্য দুইটির নাম কর। এই দুইটি মহাকাব্য থেকে গ্রীকদের সম্বন্ধে কি জানতে পারা যায় ?
৩। এথেন্স ও স্পার্টানদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ কি ? এই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ?
৪। কয়েকজন গ্রীক নাট্যকার ও ঐতিহাসিকের নাম লেখ। তাঁদের কৃতিত্ব কি ছিল ?
৫। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধের কারণ কি ছিল ? এই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ?

অষ্টম অধ্যায়

রোমের কাহিনী

রোম নগরের প্রতিষ্ঠা : গ্রীকদের মতো রোমানরাও ছিল আর্য। তারা আল্‌পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালিতে প্রবেশ করেছিল। রোমানরা স্পার্টানদের মতই বীর ছিল। তবে লেখাপড়া এবং শিল্পের কাজও তারা ভালবাসতো। তাই এথেন্সবাসীদের কীর্তিকলাপের উপর তাদের খুব শ্রদ্ধা ছিল। ইউরোপে এরাই গ্রীকসভ্যতার বিস্তার করে।

রোমানদের ধারণা ছিল যে, তাদের পূর্ব-পুরুষেরা ট্রয়ের একজন বীরের বংশধর। এখন থেকে সাতাশ শ' বছর আগে রমুলাস্ নামে একজন দলপতি টাইবার নদীর তীরে রোম শহরের পত্তন করেন। তিনিই ছিলেন রোমের প্রথম রাজা। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একজন দুষ্ট রাজা তাঁকে এবং তাঁর যমজ ভাই রিমাসকে জন্মাবার পরই মেরে ফেলবার আদেশ দেন। কিন্তু যাদের উপর এই ভার পড়ে তারা শিশু দুটিকে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেয়। একটি নেকড়ে বাঘিনী তাদের উদ্ধার করলো। সে নিজের দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। একদিন এক রাখাল লুকিয়ে শিশু দুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। তার ঘরেই এরা বড়ো হতে থাকে। অনেকদিন পরে তারা নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারলো। তখন সেই দুষ্ট রাজাকে মেরে রমুলাস রাজা হয়েছিলেন।

প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে রাজারা রোমে রাজত্ব করেন। তখন রোমের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রবীণ লোকদের একটি সভা ছিল। তার নাম ছিল সেনেট। রাজারা সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন। রোমের সর্বশেষ রাজা ছিলেন যেমন অহংকারী, তেমনি অত্যাচারী, তাই তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকে রোমানরা রাজপদকে অত্যন্ত ঘৃণা করতো।

রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংগ্রাম : রোমবাসীরা ক্রমে তাদের রাজ্য বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। সেই সময় ইটালিতে আরো

অনেক জাতি বাস করতো। প্রায় আড়াই শ’ বছর ধরে একটা-না-একটা জাতির সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ চলেছিল। ক্রমে সারা ইটালি তাদের দখলে আসে। এরপরে কাছাকাছি দ্বীপগুলির উপর তাদের দৃষ্টি পড়লো।

এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে একটি শহর ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে খুব ধনী হয়ে ওঠে। তাদের অনেকগুলি শক্তিশালী রণতরী ছিল। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে তখন তাদের প্রচণ্ড দাপট। সেখানকার উপকূলে এবং দ্বীপগুলিতে তাদের অনেকগুলি উপনিবেশ ছিল। ইটালির দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপটিরও পশ্চিম ভাগ ছিল তাদের দখলে। এই দ্বীপটির অধিকার নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

রোমানদের সঙ্গে কার্থেজবাসীদের তিনটি বড়ো বড়ো যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধ **পিউনিক যুদ্ধ** বলে খ্যাত। প্রথম যুদ্ধে কার্থেজবাসীরা হেরে গেলো। তখন সিসিলি ও সার্ডিনিয়া রোমের অধিকারে আসে। কিন্তু কার্থেজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ **হ্যামিলকার বারকা** এই পরাজয় মেনে নিলেন না। তিনি স্পেন জয় করে সেখানে নতুন করে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। এর কিছুকাল পরে তাঁর পুত্র **হ্যানিবল** কার্থেজের সেনাবাহিনীর ভার পেলেন। তিনি পিতার কাছে শপথ করেছিলেন যে, চিরকাল রোমের শত্রুতা করবেন। তাই কুড়ি বছর পরে আবার দুপক্ষে যুদ্ধ বাধলো। প্রথম যুদ্ধে রোমানরা কার্থেজের রণতরীগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাই হ্যানিবল স্পেন থেকে স্থলপথে রওনা হয়ে রোম দখল করবেন বলে স্থির করলেন। এই রকম দুঃসাহসের কাজ সেকালে কেউ কল্পনা করতে পারতো না, কিন্তু হ্যানিবল আলেকজাণ্ডারের মতই সাহসী এবং দক্ষ সেনাপতি ছিলেন।

পথে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে হ্যানিবল ইটালিতে পৌঁছে-ছিলেন। বরফে ঢাকা আল্‌পস্‌ পর্বত পার হবার সময় তাঁর অর্ধেক সৈন্য মারা পড়েছিল। কিন্তু হ্যানিবল তাতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। রোমানরাও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। পনেরো বছর ধরে অবিশ্রাম যুদ্ধ করে হ্যানিবল প্রায় সমস্ত ইটালি জয় করেছিলেন।

কিন্তু রোমানরা অসীম সাহসের সঙ্গে তাদের শহর রক্ষা করে। তাই হ্যানিবল কিছুতেই রোম অধিকার করতে পারলেন না।

এদিকে স্পেনেও দুপক্ষে যুদ্ধ চলছিল, সেখানে রোমানরাই জয়লাভ করতে থাকে। অবশেষে সিপিও নামে একজন বড় রোমান-সেনাপতি কার্থেজ আক্রমণ করলেন। তখন হ্যানিবলকে স্বদেশে ফিরতে হলো। কিন্তু সিপিওর কাছে তিনি হেরে গেলেন। জীবনে এটাই ছিল তাঁর একমাত্র পরাজয়। রোমানরা সিপিওকে **আফ্রিকেনাস**—আফ্রিকা-বিজয়ী—উপাধি দিয়ে অভিনন্দন জানালো। এই যুদ্ধের ফলে স্পেন দেশটি রোমানদের অধিকারে এসেছিল। কিন্তু তারা হ্যানিবলকে বড় ভয় করতো; তাই তারা দাবি করলো যে, হ্যানিবলকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। হ্যানিবল আত্মহত্যা করে এই অপমান এড়ালেন।

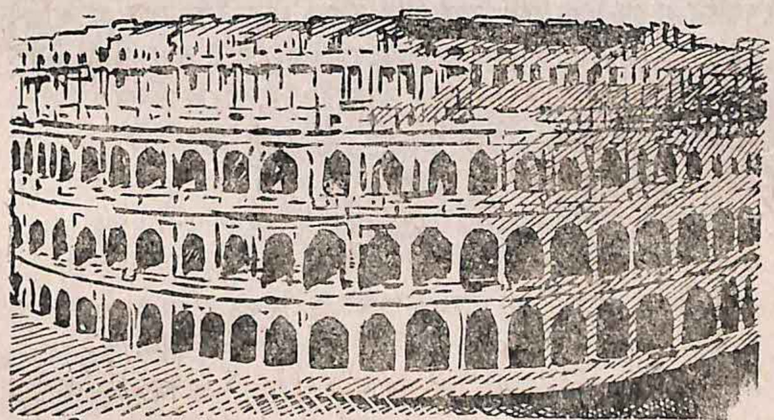
কার্থেজবাসীরা খুবই উদ্যমশীল ছিলো। এতবড় পরাজয়ের পরেও তারা একটু একটু করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে থাকে। তাই দেখে রোমানদের মনে ঈর্ষা ও ভয় জাগলো। **কেটো** নামে রোমানদের একজন বিখ্যাত নেতা সনেটে প্রত্যেকটি বক্তৃতার শেষে বলতেন, "দেলেনদা এস্ত্ কার্থাগো,"—কার্থেজ ধ্বংস করতেই হবে। তাই পঞ্চাশ বছর বাদে আবার দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। রোমানদেরই জয় হলো। তারা কার্থেজ অধিকার করে চিরকালের জন্য এই প্রাচীন নগরীটিকে পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেললো।

রোমানদের আদি সমাজ : একেবারে গোড়ার দিকে রোমে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ—এই দুই শ্রেণীর লোক ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনদের বলা হতো প্যাট্রিসিয়ান, আর সাধারণ লোকদের প্লেবিয়ান্। প্যাট্রিসিয়ান্‌রা মনে করতো যে তারাই হলো সাচ্চা রোমান। তাদের পূর্ব-পুরুষেরাই রোমে প্রথম বসতিস্থাপন করেছিল। পরে যারা রোমে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হলো, এবং যে সকল দাসদের প্রভুরা দয়া করে মুক্তি দিতেন তারা সকলে একত্রে হলো জনসাধারণ। এরা খুব গরীব ছিল। ছোটো ছোটো জমিতে তারা চাষবাস করতো, আর যুদ্ধের সময় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতো, এদের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ান্‌দের কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলো না।

প্যাট্রিসিয়ান্ ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব : রাজপদ উঠে যাবার পর প্যাট্রিসিয়ান্‌রাই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা দখল করে। তাদের হয়ে সেনেট সমস্ত রাজকার্য পরিচালনা করতো। এতে প্লেবিয়ানদের কোনো অংশ ছিলো না। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক—সব দিক দিয়েই দাবিয়ে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু প্লেবিয়ানরা জানতো যে, তাদের সাহায্য না পেলে রাজাকেও তাড়ানো যেতো না, রাজ্যবিস্তার করাও চলতো না। তাই রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের অল্প কিছুকাল পরেই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্য দ্বন্দ্ব বেধে যায়। দেড়শ' বছর ধরে দুই পক্ষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চলেছিল। তিন-তিনবার প্লেবিয়ানরা রোম ছেড়ে গিয়ে নতুন শহর গড়ে তোলবার হুমকি দেখায়। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। রোমানদের একটা বড়ো গুণ ছিল, তারা অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে পারতো। তাই প্যাট্রিসিয়ানরা ধাপে ধাপে প্লেবিয়ানদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছিল। তখন থেকে এই দুই শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে আর কোনো তফাৎ থাকলো না।

রোম সাম্রাজ্যের নাগরিক অধিকার : আমরা এর আগে দেখেছি যে, এথেন্সে সকল শ্রেণীর লোক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ



রোমের কলোসিয়াম্

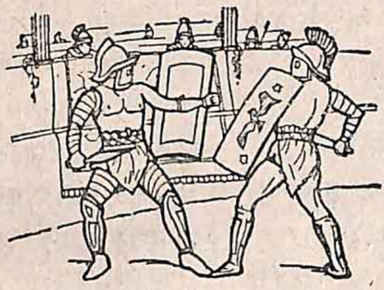
করতে পারতো। কিন্তু যে সকল বিদেশী সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতো অথবা যাদের তারা নিজেদের অধীনে এনেছিল তাদের

কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। রোমানরা কিন্তু এ বিষয়ে অনেক উদারতা দেখিয়েছিল। একমাত্র দাসরা ছাড়া রোমে যারা বাস করতো তারা সকলেই পূর্ণ নাগরিক অধিকার পেয়েছিল। সমস্ত ইটালিতে যখন রোমের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় তখন সেখানকার অন্যান্য জাতিরা রোমানদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হয়। তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীন ছিল। কিন্তু এতে তারা সন্তুষ্ট হলো না। তারা রোমানদের সমান সমান নাগরিক অধিকার দাবি করে। কিন্তু রোমানরা তাতে রাজী হলো না। এই নিয়ে অনেককাল ঝগড়া-বিবাদ চলে। তারপর দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধের শেষে ইটালির সকল জাতি ক্রমে নাগরিক অধিকার লাভ করেছিল। তখন সমস্ত ইটালি হয়ে দাঁড়ালো যেন একটি "প্রসারিত রোম"। এর প্রায় এক শ' বছর পরে কারাকালা নামে একজন রোমান-সম্রাট রোম সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন। তাদের কাছে এর মূল্য ছিলো খুব বেশি। কারণ এই অধিকার দাবি করে তারা সম্রাটদের কাছ থেকে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারতো।

রোমের দাসত্ব প্রথা ঃ প্রাচীন যুগে এমন কোনো দেশ ছিল না যেখানে দাসত্ব-প্রথা দেখা যায় না। কিন্তু রোমে দাসদের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করা হতো তার তুলনা মেলে না। যারা একটু ভাগ্যবান ছিল তারা ঘরের কাজ করতো। যারা লেখাপড়া জানতো তারা বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াতো, অথবা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসাব রাখা প্রভৃতি কাজে লাগানো হতো। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। বেশির ভাগ দাসদের বড়ো বড়ো ক্ষেত-খামারে চাষের কাজ, খনির কাজ, জাহাজের দাঁড় টানা, বড় বড় ইমারত তৈরি, রাস্তা তৈরি, খাল-কাটা প্রভৃতি ভারী কাজে লাগানো হতো। যাতে পালিয়ে না যেতে পারে তাই এদের পা সব সময় শিকল দিয়ে বাঁধা থাকতো। এদের চাবুক মেরে কাজ করানো ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। রাতের বেলাও এদের মাটির নীচে শিকল পরা অবস্থায় ঘুমোতে হতো।

দাসদের মধ্যে একদল ছিল যাদের বলা হতো গ্লাডিয়েটর। এরা কলোসিয়াম্ নামে একরকম উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়িতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে

খেলা দেখাতো। হয়তো দুজনেই মরতো, না হলে একজনকে না মেরে অপর জনের নিস্তার ছিল না। আর এক রকম খেলা ছিল যখন এদের একখানা ছোটো ছোরা হাতে বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হতো। এদের ভাগ্যে যা ঘটতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরকম নিষ্ঠুর খেলা দেখে রোমবাসীরা প্রচুর আনন্দ পেতো।


গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ

রোমবাসীদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্য দাসদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। কয়েকবার তারা নিষ্ফল বিদ্রোহ করে। একবার স্পার্টাকাস নামে একজন গ্লাডিয়েটরের নেতৃত্বে কয়েক হাজার ক্রীতদাস বিদ্রোহী হয়েছিল। দু'বছর ধরে রোমান-সৈন্যদের সঙ্গে এরা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের পরাজয় হলো। যারা বেঁচে ছিল তাদের রাজপথের ধারে ধারে ক্রুশ-বিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

জুলিয়াস্ সীজারের অভ্যুত্থানঃ আগের যুগের রোমানরা অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন করতো। তাদের মধ্যে কোনো আত্মম্ভরিতা বা বিলাসিতা ছিল না। তারা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ছিল। কিন্তু কার্থেজ ও গ্রীস জয় করার পর থেকে তাদের জীবনযাত্রা বদলে যায়। এই সময় একটি ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ-বিদেশে তারা অনেক জমি-জমা করে। ক্রীতদাসরা এগুলি চাষ করতো। তাতে তাদের প্রচুর লাভ হতে থাকে। আবার এই সময় ক্রীতদাসদের দিয়ে তারা সুসজ্জিত পল্লীভবন নির্মাণ করিয়ে নিতো। সেখানে তারা বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতো। কাজেই নতুন যুগের


জুলিয়াস্ সীজার

বড়লোকদের মধ্যে আদি যুগের সদ্‌গুণ সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এদিকে সাধারণ লোকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়তে লাগলো। কারণ ক্রীতদাসদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা সস্তায় ফসল ফলাতে পারতো না। ঘর-গৃহস্থালির কাজের জন্যও বড়োলোকরা তাদের ডাকতো না। তাই বেকার হয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে রোমে এসে জড়ো হতে লাগলো। রোমের দু'জন নেতা এদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করলেন। তাতে বড়োলোকেরা চটে গেল। এঁদের দুজনকেই মেরে ফেলা হয়। এর ফলে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয় এবং রোমের শাসনব্যবস্থাও ভেঙে পড়লো।

এই সময় রোমে পর পর কয়েকজন বিশেষ শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে খুশি-মতো রাজ্য শাসন করতেন। এই সকল নেতাদের মধ্যে জুলিয়াস সীজার ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন একজন খুব বড়ো যোদ্ধা। গল্‌ দেশ (এখনকার ফ্রান্স ও বেলজিয়াম্) জয় করে তিনি সেখানে রোমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এতে সাধারণ রোমানদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। সেনেটের সদস্যরা কিন্তু ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে একা স্বদেশে ফিরে আসতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সীজার এই আদেশ অমান্য করে সসৈন্যে রোমে এসে উপস্থিত হন। তখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিন্তু কেউই তাঁর বিজয়যাত্রা রোধ করতে পারলেন না। ফলে তিনি রোম সাম্রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হলেন।

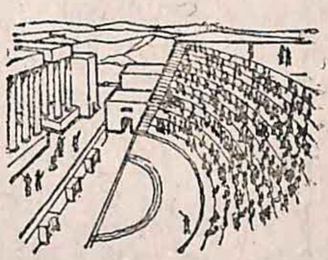
দেশের শাসনভার হাতে নিয়ে সীজার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনেক ভালো ভালো কাজও করেছিলেন। সীজার ক্রমে সিংহাসন ও রাজদণ্ড ব্যবহার করতে শুরু করলেন। সেনেটের সদস্যদের মধ্যে অনেকে মনে করলেন যে, সীজার প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করে রাজা হবার চেষ্টা করছেন। এঁরা রাজপদকে বড় ঘৃণা করতেন। তাই তাঁরা ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত সীজারকে হত্যা করেন।

নব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : এর পরে আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অক্টেভিয়ান্ নামে সীজারের একজন নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তিনি সমস্ত বিপক্ষ দলকে পরাজিত করে সীজারের মতই সর্বেসর্বা হয়ে

উঠলেন। সেনেট তাঁকে অগাস্টাস্ অর্থাৎ "মহা-মহিমান্বিত" উপাধি দেয়। সেই সময় থেকে রোমে 'সম্রাটদের যুগ' আরম্ভ হয়েছিল।

অগাস্টাস্ সুশাসক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু সব সম্রাটই তাঁর মতো ভালো ছিলেন না। কেউ কেউ ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর, আবার অনেকে ছিলেন অত্যন্ত খামখেয়ালী এবং অত্যাচারী। তবে কয়েকজন ভালো রাজাও ছিলেন।

সম্রাটেরা প্রায় সকলেই জাঁকজমক ভালোবাসতেন। তাঁদের আদেশে রোমে সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের দালান-কোঠা, বিজয়স্তম্ভ ও তোরণ, বড়ো বড়ো স্নানাগার, ফোরাম্, অ্যাম্ফিথিয়েটার, কলোসিয়াম্ প্রভৃতি তৈরি হয়েছিল। ফোরামে লোকেরা সভাসমিতি ও অন্যান্য কাজকর্মের জন্য জমা হতো। অ্যাম্ফিথিয়েটারে অভিনয়, সার্কাস প্রভৃতি দেখানো হতো। তখন বন-সম্পদে ও সৌন্দর্যে রোমই ছিল সবার সেরা।

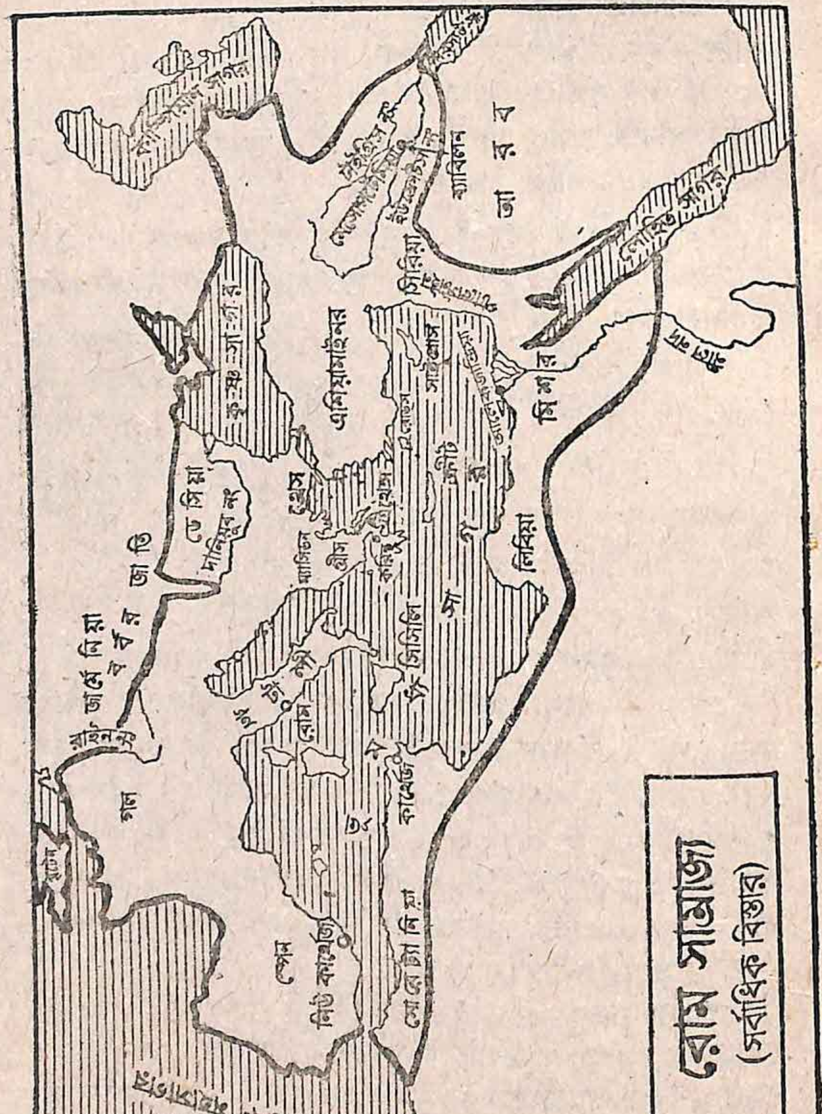


অ্যাম্ফিথিয়েটারের দর্শক-গ্যালারি

রোমের ভালো ভালো সম্রাটরা দেশরক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। সুশাসনের জন্য তাঁরা অনেক আইন-কানুনও প্রচলন করেছিলেন। এইজন্য প্রায় দু শ' বছর ধরে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিলো। রোমানদের চরম উন্নতির দিনে তাদের সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। ইটালি, স্পেন, কার্থেজ, গ্রীস্, গল ছাড়াও ইংলণ্ড, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশগুলিও তারা নিজেদের অধীনে আনে।

রোমের পতন: রোমের গৌরব কিন্তু চিরকাল অটুট রইল না। পরবর্তী দু শ' বছরের মধ্যেই বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতন হলো। সম্রাটেরা হয়ে উঠেছিলেন ভয়ানক অত্যাচারী। রাজ্যশাসনের জন্য তাঁরা সৈন্যদের উপর নির্ভর করতেন। তাই আসল ক্ষমতা সৈন্যদের হাতেই চলে গিয়েছিল। বিদ্রোহী সৈন্যরা খেয়ালখুশি মতো সম্রাটদের সিংহাসনে বসাতো বা সিংহাসনচ্যুত করতো। এর ফলে

দেশ জুড়ে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। যাঁরা দেশের গণ্যমান্য ছিলেন, তাঁরা হয়তো এর প্রতিকার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা



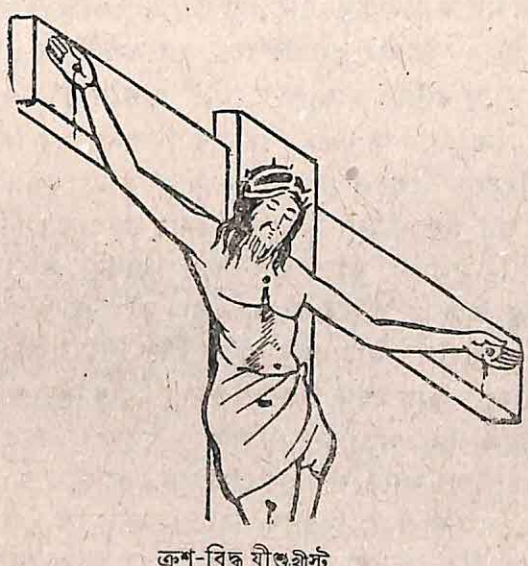
রোম সাম্রাজ্য (সর্বাধিক বিস্তার)

বিলাস-ব্যসনে ডুবে রইলেন। মোটা কর দিতে হতো বলে

সাম্রাজ্যের সাধারণ লোকেরাও অসন্তুষ্ট ছিল। এই সব নানা কারণে রোমের শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে আসছিল।

রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে তখন গথ, ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরা বাস করতো। রোমানরা তাদের বলতো বর্বর। এই বর্বরদের আক্রমণের ফলেই শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে রোমান-রাজত্বের অবসান হয়।

খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারঃ ইহুদীদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই একটা কথা চলে আসছিল যে, তাদের মধ্যে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন যিনি তাদের সব দুঃখ দূর করে দেবেন। অগাস্টাস্ যখন রোমের সম্রাট তখন ইহুদীদের মধ্যে সত্যই একজন



ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুখ্রীস্ট

মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি হলেন খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীস্ট বা ত্রাণকর্তা যীশু।

প্যালেস্টাইনে নাজারেথ শহরে যোশেফ নামে এক গরীব ছুতোর বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মেরী। যীশু এঁদেরই সন্তান।

এই সময় জুডিয়া প্রদেশের গহন বনে যোহন্ নামে এক সাধু-পুরুষ বাস করতেন। তিনি প্রচার করতেন যে, শীঘ্র পৃথিবীতে

স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবে। যীশু যোহনের কাছে দীক্ষা নেন। যোহনের মৃত্যুর পর তাঁর কাজের ভার যীশু নিজে নিলেন। তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন—"ঈশ্বরকে ভালবাসো ; মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সন্তান, তাই প্রত্যেককে নিজের ভাই মনে করে স্নেহ করবে ; ভালবেসে শত্রুর হৃদয় জয় করবে ; অপকারের বদলে করবে উপকার ; আর সৎ জীবন যাপন করে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলবে।" অনেক লোকই তাঁর শিষ্য হলো। এঁদের মধ্যে বারোজন ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয়।

যীশুর ধর্ম-প্রচারের ফলে ইহুদীদের প্রাচীন সমাজ ও পুরোহিতদের ক্ষমতা নষ্ট হবার উপক্রম হলো। একবার যীশু যখন জেরুজালেম্ নগরে যান তখন অনেকে তাঁকে 'ইহুদীদের রাজা' বলে প্রচার করেন। ইহুদী পুরোহিতরা প্যালেস্টাইনের শাসনকর্তা পিলাতের কাছে নালিশ জানাল যে, যীশু রাজদ্রোহী, তিনি নিজেই রাজা হতে চান। জুডাস্ নামে তাঁর এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে যীশুকে ধরিয়ে দিলেন। নানা রকম লাঞ্ছনা ও অপমানের পর যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময়েও তিনি ঈশ্বরের কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালেন, "হে আমার প্রভু, এরা কি করছে তা জানে না। তুমি এদের ক্ষমা করো।" যীশুর স্বর্গলাভের পর তাঁর দুজন প্রধান শিষ্য পিটার এবং পল রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁর মহান্ উপদেশগুলি প্রচার করতে লাগলেন। এজন্য তাঁদের বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। রোমান সম্রাটদের আদেশে তখন খ্রীস্টানদের পুড়িয়ে মারা হতো ; কখনও কখনও বা কলোসিয়ামে হিংস্র জন্তুর মুখে ফেলে দেওয়া হতো। সম্রাটরা ভাবতেন, এতে ভয় পেয়ে আর কেউ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হবে না। কিন্তু খ্রীস্টানদের অপূর্ব ধর্মনিষ্ঠা আর সাহস দেখে রোমানদের মধ্যে অনেকে এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো।

যীশুর স্বর্গারোহণের তিনশ' বছর পরে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন্ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে এই ধর্মপ্রচারের পথে আর কোন বাধা রইলো না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রোম সাম্রাজ্যেই খ্রীস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব	৭৫৩	রোম শহরের প্রতিষ্ঠা
„	৫১০	রোম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা
„	২৬৪-২৪১	রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ
„	২১৮-০২	„ „ „ দ্বিতীয় যুদ্ধ
„	১৪৯-৪৩	„ „ „ তৃতীয় যুদ্ধ
	৪৮	জুলিয়াস সীজারের অভ্যুত্থান
	৪৪	সীজারের হত্যা
	২৭	রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
	১৪	অগাস্টাসের মৃত্যু
খ্রীস্টাব্দ	৩৩	যীশুখ্রীস্টের স্বর্গারোহণ
„	৩৬৭-৭৬	সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের রাজত্বকাল
„	৪৬৬	পশ্চিম ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের পতন

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১। রোমানরা কিভাবে ইটালিতে প্রবেশ করেছিল ?
২। রোমের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?
৩। সেনেট কাকে বলে ?
৪। রোমে কিভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
৫। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত ছিল ?
৬। রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধের কারণ কি ?
৭। পিউনিক যুদ্ধ কাকে বলে ?
৮। হ্যানিবল কে ছিলেন ?
৯। হ্যানিবল পিতার কাছে কি শপথ করেছিলেন ?
১০। হ্যানিবল কিছুতেই রোম জয় করতে পারলেন না কেন ?
১১। একজন বড় রোমান সেনাপতির নাম কর।
১২। হ্যানিবলের জীবনে একমাত্র পরাজয় কোন্‌টি ?
১৩। রোমানরা সিপিওকে কি উপাধি দিয়ে অভিনন্দন জানালো ?
১৪। হ্যানিবল আত্মহত্যা করেন কেন ?

১৫। কেটো কে? তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি কি ছিল?
১৬। প্রথম দিকে রোমে কয় শ্রেণীর লোক ছিল?
১৭। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কাদের বলা হয়?
১৮। কোন্ রোম সম্রাট সমস্ত রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন?
১৯। রোমে ক্রীতদাসদের কি কি কাজ করতে হোত?
২০। ক্রীতদাসদের পায়ে সব সময় শিকল পরান থাকতো কেন?
২১। গ্লাডিয়েটর কাদের বলা হয়?
২২। কলোসিয়াম কাকে বলা হয়?
২৩। স্পার্টাকাস কে ছিলেন?
২৪। রোমের একজন শক্তিশালী নেতার নাম কর।
২৫। সেনেট কাকে অগাস্টাস উপাধি দিয়েছিল?
২৬। অ্যাম্ফিথিয়েটার কাকে বলা হয়?
২৭। রোমানদের চরম উন্নতির দিনে তাদের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল?
২৮। রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে কোন্ কোন্ উপজাতি বাস করত?
২৯। খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?
৩০। যীশুর পিতা-মাতার নাম কি ছিল?
৩১। যোহন কে? তিনি কি প্রচার করেছিলেন?
৩২। যীশুকে কিভাবে মেরে ফেলা হয়?
৩৩। মৃত্যুর সময় যীশু কি বলে প্রার্থনা করেছিলেন?
৩৪। যীশুর দু'জন শিষ্যের নাম কর।
৩৫। কন্স্ট্যান্টাইন কে? তিনি কবে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন?

কোন্টা ঠিক বল:

(ক) রোমের প্রথম রাজা ছিলেন — জুলিয়াস সীজার/রমুলাস/কন্স্ট্যান্টাইন।
(খ) কার্থেজ নামক শহরটি ছিল — স্পেনে/মিশরে/উত্তর আফ্রিকায়।
(গ) হ্যামিলকার বার্কার পুত্র ছিলেন — কেটো/হ্যানিবল/নীরো।
(ঘ) স্পার্টাকাস ছিলেন — রোমান নেতা/ক্রীতদাসদের নেতা/প্যাট্রিসিয়ানদের নেতা।
(ঙ) রোমের সর্বপ্রথম সম্রাটের নাম — জুলিয়াস সীজার/অগাস্টাস/কেটো।

(চ) রোমে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনদের বলা হত — ক্রীতদাস/প্যাট্রিসিয়ান/প্লেবিয়ান।

(ছ) যীশু ছিলেন — ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক/খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তক/রোমান ধর্মের প্রবর্তক।

সঠিক বাক্যগুলোর পাশে হ্যাঁ লেখ ঃ

(ক) রোমে ক্রীতদাসদের অবস্থা ভাল ছিল।

(খ) কলোসিয়াম উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ি।

(গ) প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে একদলকে বলা হোত গ্ল্যাডিয়েটর।

(ঘ) রোমানদের সঙ্গে কার্থেজবাসীদের যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে বিখ্যাত।

(ঙ) রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ বাধে ক্রীট দ্বীপটির ওপর অধিকার নিয়ে।

(চ) সিপিওর কাছে হেরে যাওয়াই হ্যানিবলের জীবনে একমাত্র পরাজয়।

(ছ) রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কার্থেজের জয় হয়।

(জ) অক্টোভিয়ান ছিলেন সীজারের নিকট-আত্মীয়।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) এখন থেকে সাতাশ শ' বছরে আগে — নামে একজন দলপতি — নদীর তীরে — শহরের পত্তন করেন।

(খ) রোমের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রবীণ লোকদের নিয়ে সভাকে বলা হোত —।

(গ) উত্তর আফ্রিকায় — নামে এক শহর ছিল।

(ঘ) রোমানরা সিপিওকে — উপাধি দিয়ে অভিনন্দন জানালো।

(ঙ) কেটো সেনেটে প্রতিটি বক্তৃতার শেষে বলতেন — — —।

(চ) রোমে সাধারণ শ্রেণীর লোকদের বলা হয় হোত —।

(ছ) — নামে এক রোমান সম্রাট রোম সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার দিয়েছিলেন।

(জ) রোমে ক্রীতদাসদের মধ্যে একদলকে বলা হোত —।

(ঝ) যীশু — কাছে দীক্ষা নেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। রমুলাস কিভাবে রোমের রাজা হয়েছিলেন ?

২। কার্থেজের অধিবাসীরা কি কি অঞ্চল অধিকার করেছিল ?

৩। প্লেবিয়ান কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ?

৪। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে কেন দ্বন্দ্ব বেধেছিল ?

৫। রোম সাম্রাজ্যে সকল অধিবাসীরা কিভাবে নাগরিক অধিকার লাভ করে ?

৬। গ্ল্যাডিয়েটরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান ?

৭। রোমানদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের মধ্যে কিরূপ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল ?

৮। জুলিয়াস সীজারের পূর্বে রোমে সাধারণ লোকদের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৯। রোমের সম্রাটেরা জাঁক-জমক ভালবাসতেন—তার কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

১০। রোমের শক্তি কমে আসার কারণ কি ?

১১। কিভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয় ?

১২। যীশু সাধারণ লোকদের কি উপদেশ দিতেন ?

১৩। ইহুদী পুরোহিতরা যীশুর বিরুদ্ধে কি নালিশ জানায় ?

১৪। রোমান সম্রাটেরা খ্রীস্টানদের ওপর কিরূপ অত্যাচার করত ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। পিউনিক যুদ্ধ কাকে বলে ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

২। রোমে দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে কি জান ?

৩। জুলিয়াস সীজার কে ? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান ?

৪। খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

নবম অধ্যায়

চীনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

মহান্ সাঙ্ বংশের রাজত্বকাল: আমরা এর আগে দেখেছি যে এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে চীনসভ্যতার গোড়া-পত্তন হয়েছিল। ভারতবর্ষের মতো চীন-সভ্যতারও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। এগুলির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল সাঙ্ রাজাদের আমলে। হোয়াং-হো নদীর তীরে এক জায়গায় কতকগুলি বড় বড় স্তূপ ছিল। এগুলিকে বলা হতো "ইনের স্তূপ। এই স্তূপগুলি খুঁড়ে সাঙ্ রাজাদের রাজধানী আনইয়াঙ্ আবিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে কচ্ছপের খোলার উপর অনেকগুলি লেখা পাওয়া গেছে। এগুলি অনেকটা দেখতে ছিল এখনকার চীনা লেখার মতো। তাছাড়া স্তূপগুলি খুঁড়ে সেকালের বহু জিনিসপত্র, বাড়িঘর প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব দেখে বোঝা যায় যে, সাঙ্ যুগে জীবনযাত্রা অনেক উন্নত ধরনের ছিল।

সাঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঙ্ নামে একজন শক্তিশালী রাজা। চীনের প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, তিনি একহাজার আটশ' শহর জয় করেছিলেন। সে যাই হোক, আসলে তাঁর রাজ্যটি খুব বড়ো ছিল না। ইয়াংসি-কিয়াঙ্ নদীর মোহনার উত্তর থেকে শুরু করে হোয়াং-হো নদীর নিম্ন-উপত্যকা পর্যন্ত সাঙ্ রাজারা রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

চীনের মানুষ তখনও মাছ ধরে, পশুপাখি শিকার করে এবং চাষ-আবাদ করে জীবনধারণ করতো। শিল্পের কাজে এরা যে রকম দক্ষতা অর্জন করেছিল পৃথিবীর আর কোথাও তা দেখা যায় না। এরা মাটি, পাথর, হাতির দাঁত এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে অনেক রকম বাসনপত্র তৈরি করতো। সেগুলির উপর যে সকল চিত্র এবং সূক্ষ্ম মিনেকরা কাজ দেখা যায় তা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। একমাত্র চীনের শিল্পীরাই এই রকম কাজ করতে পারতো। পরের যুগেও এই একই

ধাঁচের বাসনপত্র তৈরি হতো। চীনে বাড়িঘর তৈরির যে বিশেষ নির্মাণ-পদ্ধতি দেখা যায় তাও সাঙ্ যুগ থেকে চলে আসছে। এগুলি কাঠ দিয়ে তৈরি হতো, ছাদগুলি ছিল তেকোণা আর ছাদের কিনারাগুলি থাকতো একটু ঢেউ খেলানো। ভেতরের দেওয়ালগুলি সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকতো।

সাঙ্ যুগের সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল। যারা যুদ্ধ করতো, তারাই ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। এরা রাজকার্যে নানারকম সাহায্য করতো। বণিক, শিল্পী ও চাষীরা ছিল মধ্যম শ্রেণীর লোক। আর দাসদের স্থান ছিল সকলের নীচে। সাঙ্ যুগে দৈবজ্ঞদেরও খুব সম্মান ছিল। তাঁরা পরিষ্কার ও পালিশ-করা কচ্ছপের খোলার সাহায্যে লোকের ভাগ্য গণনা করতেন। কেউ কোনো কিছু জানতে চাইলে এঁরা খোলাগুলির উপর তপ্ত লোহার শলা বিঁধিয়ে দিতেন। এর ফলে যে সব দাগ ও আঁচড় পড়তো তা দেখে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। পরে খোলাগুলির উপর প্রশ্ন ও উত্তর লিখে মাটির নীচে রেখে দেওয়া হতো। ইনের স্তূপ খুঁড়ে এরকম অনেক খোলা পাওয়া গেছে।

প্রাচীনযুগের অন্যান্য জাতিদের মতো চীনের মানুষরাও নানা দেব-দেবীর পূজা করতো। মৃত পূর্বপুরুষদেরও এরা দেবতা বলে মনে করতো।

কনফুসিয়াসের আবির্ভাব : সাঙ্ বংশের পর চাউ বংশ রাজত্ব করে। এই সময় চীনে সামন্ত-প্রথার প্রচলন হয়। চাউ রাজত্বের শেষদিকে চীনদেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। সামন্ত রাজারা পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা মারামারি কাটাকাটি করতো, আর প্রজাদের উপরও যথেচ্ছ অত্যাচার চলতো। এর উপর আবার উত্তর দিক থেকে হুন, ইউচি প্রভৃতি বর্বর জাতিরা চীনে হানা দিতে থাকে। ফলে সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্টের সীমা-পরিসীমা রইলো না। এই রকম দুরবস্থার সময় চীনের মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াসের আবির্ভাব হয়েছিল।

কি করে দেশের দুরবস্থার প্রতিকার করা যেতে পারে, আগেই বা

কেন এরকম দুঃখ-কষ্ট ছিলো না—কনফুসিয়াস এইসব কথা ভাবতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন ইতিহাস চর্চা করতে লাগলেন। ক্রমে প্রাচীনকালের রীতি-নীতির উপর তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি বুঝলেন, দেশের লোকের নৈতিক অধঃপতনই দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। মানুষ যদি চরিত্রবান্ হয়, তার মন যদি সুন্দর আর মহান্ হয়, তবেই সমাজে শান্তি থাকতে পারে।


কনফুসিয়াস

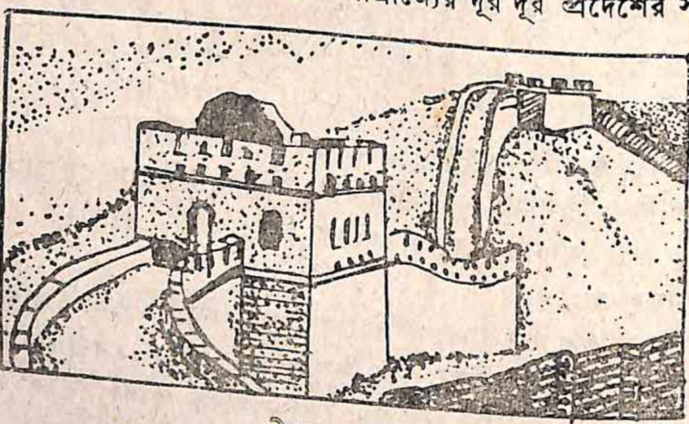
এই নৈতিক শিক্ষা প্রচার করবার জন্য কনফুসিয়াস শিক্ষকতা শুরু করলেন। প্রাচীন ইতিহাস, পৌরাণিক গাথা, ভদ্র আচার-ব্যবহার এইসব নিয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

অল্পকালের মধ্যেই কনফুসিয়াসের গভীর জ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একজন বড় সামন্তরাজা তাঁকে একটি শহরের শাসনভার দেন। তাঁর শাসনে সেই শহরের অধিবাসীদের খুব উন্নতি হয়েছিল; তাদের মধ্যে সুখ ও শান্তি ফিরে এসেছিল।

এর কিছুদিন পরে কনফুসিয়াস চাকরি ছেড়ে দিলেন। তারপর বারো বছর ধরে তিনি চীনের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর উপদেশগুলি প্রচার করতে থাকেন। কনফুসিয়াস বলতেন, প্রাচীনকাল থেকে যে রীতিনীতি চলে আসছে তার প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পিতা-মাতা আর গুরুজনকে ভক্তি করবে; প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দেশের রাজাকে প্রজারা পিতার

মতো দেখবে ; এবং রাজাও প্রজাদের সন্তানের মতো পালন করবেন। এইভাবে জীবনযাপন করলে দেশে কোনো রকম অশান্তি থাকবে না। কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর চীনের লোকেরা তাঁর উপদেশগুলি মেনে নিয়েছিল। সে সময় থেকে বহুকাল পর্যন্ত সেগুলিই ছিল চীনবাসীদের আদর্শ।

চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : সামন্তরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে চাউ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর এক সময় চাউ বংশের রাজত্বের অবসান হয়। তখন একজন সামন্তরাজ অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে সম্রাটের পদ অধিকার করেন। ইনিই হলেন প্রসিদ্ধ শি হুয়াঙ্-তি। তিনি নিজের বাহুবলে প্রায় সমগ্র হোয়াঙ্-হো এবং ইয়াংসি-কিয়াং উপত্যকায় রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তখন তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য চীনের নামে তাঁর সাম্রাজ্যের নামও হয় চীন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সাম্রাজ্যের দূর দূর প্রদেশের সঙ্গে



চীনের প্রাচীর

যোগাযোগ রাখবার জন্য তিনি বড় বড় রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। উত্তরের বর্বর জাতিগুলির বার বার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি পৃথিবী বিখ্যাত চীনের বিশাল প্রাচীরটি নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। অনেক পরে এটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই প্রাচীরটি ছিল আঠারো শ' মাইল লম্বা, বাইশ ফুট উঁচু, আর কুড়ি ফুট চওড়া, এর উপরে এক শ' ফুট অন্তর চল্লিশ ফুট উঁচু এক একটি বুরুজ ছিল।

শি হুয়াং-তি সুদক্ষ সম্রাট হয়েও জনপ্রিয় হতে পারেননি। তিনি প্রাচীন রীতি-নীতির কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো কনফুসিয়াসের উপদেশগুলি। তাই তিনি কনফুসিয়াসের বইগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ দেন। এর ফলে চীনের বহু মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শি হুয়াং-তির মৃত্যুর কিছু দিনের মধ্যে চীন বংশের অবসান হয়।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৮ কন্‌ফুসিয়াস্

২৫৫ শি হুয়াং-তির সিংহাসনে আরোহণ

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। চীনসভ্যতার গোড়াপত্তন কবে হয়েছিল ?

২। চীনসভ্যতার বৈশিষ্ট্য কাদের আমলে সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ?

৩। 'ইনের স্তূপ' কাকে বলে ? এই স্তূপগুলো থেকে কি আবিষ্কৃত হয়েছে ?

৪। সাঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

৫। সাঙ্ যুগে সমাজে কয় শ্রেণীর লোক ছিল ?

৬। সাঙ্ বংশের পর কোন্ বংশ রাজত্ব করেছিলেন ?

৭। কনফুসিয়াস কে ছিলেন ?

৮। শি হুয়াং-তি কে ছিলেন ?

৯। তিনি কোথায় রাজ্যবিস্তার করেছিলেন ?

১০। চীনের বিশাল প্রাচীরটি কে তৈরি করতে শুরু করেন ?

১১। চীনের বিশাল প্রাচীরটির উচ্চতা কত ছিল ?

সঠিক বাক্যগুলোর পাশে হ্যাঁ লেখ ঃ

(ক) তাঙ এক হাজার আটশ শহর জয় করেছিলেন।

(খ) চীনের বাড়িঘরগুলি বাঁশ দিয়ে তৈরি হোত।

(গ) চীন সমাজে বণিক, শিল্পী ও চাষীরা ছিল উচ্চশ্রেণীর লোক।

(ঘ) সাঙ্ যুগে দৈবজ্ঞদের খুবই সম্মান ছিল।

(ঙ) চাউ বংশের রাজত্বকালে চীনে সামন্ত প্রথা প্রচলিত হয়।

(চ) কন্‌ফুসিয়াসের মৃত্যুর পর চীনের লোকেরা তাঁর উপদেশগুলি মেনে নিয়েছিল।
(ছ) চীনের বিশাল প্রাচীরটি ছিল এগারো শ' মাইল লম্বা।
(জ) শি হুয়াং-তি কন্‌ফুসিয়াসের বইগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেন।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) ইনের স্তূপ খুঁড়ে — রাজাদের রাজধানী — আবিষ্কার করা হয়েছে।
(খ) সাঙ্‌ যুগে — স্থান ছিল সকলের নীচে।
(গ) চাউ রাজত্বের শেষদিকে উত্তর দিক থেকে —, — প্রভৃতি বর্বর জাতিরা চীনে হানা দেয়।
(ঘ) চীনের বিশাল প্রাচীরটি — মাইল লম্বা, — ফুট উঁচু আর — ফুট চওড়া।
(ঙ) — মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে চীন বংশের অবসান হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। তাঙ্‌ কে ছিলেন? তাঁর রাজ্যসীমানা বর্ণনা কর।
২। শিল্পের কাজে চীনবাসীরা কিরূপ দক্ষতা অর্জন করেছিল?
৩। চীনে বাড়িঘর তৈরির কি পদ্ধতি ছিল?
৪। সাঙ্‌ যুগে সমাজে কয় শ্রেণীর মানুষ ছিল? তাদের বর্ণনা দাও।
৫। সাঙ্‌ যুগের দৈবজ্ঞরা কিভাবে ভাগ্য গণনা করত?
৬। চীনে কনফুসিয়াস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন?
৭। কনফুসিয়াস দেশের সম্বন্ধে কি ভাবতে থাকেন?
৮। শাসক হিসাবে কনফুসিয়াসের পরিচয় দাও।
৯। কনফুসিয়াস দেশবাসীকে কি উপদেশ দিয়েছেন?
১০। শি হুয়াং-তি কে? তাঁর সাম্রাজ্যসীমার পরিচয় দাও।
১১। চীনের বিশাল প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ রাজাদের আমলে চীনসভ্যতার প্রকাশ হয়েছিল? ঐ রাজাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান?
২। কনফুসিয়াস কে? তিনি কিভাবে চীনবাসীর নিকট বিশেষ স্থান অধিকার করেন?
৩। চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি জান?

দশম অধ্যায়

ক. ভারতের ইতিহাসের ধারা

ভারতে আর্যদের আগমন ও বসতি-বিস্তার : প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যদের একটি শাখা ভারতে আসে। তারা এদেশে এসে প্রথমে পূর্ব-আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এর বেশ কিছুকাল পরে তারা গঙ্গা এবং যমুনা নদীর তীর ধরে এগোতে থাকে। ক্রমে সমস্ত উত্তর ভারতে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এইজন্য উত্তর ভারতের আর এক নাম আর্যাবর্ত। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তাদের প্রবেশ করতে বহুদিন লেগেছিল। বিন্ধ্য পর্বত তাদের অগ্রগতি রোধ করে। অনেকে বলেন আর্যরাই সিন্ধুতীরের সভ্যতার ধ্বংস সাধন করেছিল।

বেদ : এদেশে এসে আর্য ঋষিরা এক অপূর্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। এর নাম হলো 'বেদ'। বেদের চারটি ভাগ আছে—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। সর্বপ্রথমে রচিত হয় ঋগ্বেদ। ঋষিরা দেবতাদের উদ্দেশে যে সব ছন্দোবদ্ধ স্তব-স্তুতি রচনা করেছিলেন সেগুলি এই ঋগ্বেদে আছে। বেদ থেকে আর্যদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা : আর্য সমাজে প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিনটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞ করতেন। ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন। বৈশ্যরা কৃষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। ভারতের যে সকল আদিবাসী আর্যদের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিল তাদের নিয়ে একটি চতুর্থ বর্ণের সৃষ্টি হয়। তাদের স্থান ছিল সকলের নীচে। তারা অন্য তিন বর্ণের সেবা-যত্ন করতো। প্রথমে এক বর্ণের সঙ্গে অপর বর্ণের বিবাহ কিংবা আহারাদিতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণদের স্থান হয় সবার ওপরে। তখন এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহ ও আহারাদি নিষিদ্ধ হয়।

উচ্চ বর্ণের আর্যদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের, প্রথম জীবনে গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য পালন ও বিদ্যা অর্জন করতে হতো। তারপর তাঁরা

বিবাহ করে সংসারী হতেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা বনে গিয়ে ধর্মালোচনা করতেন। তারপর অনেকে সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন। এই চারটি অবস্থাকে যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম বলা হতো।

আর্যরা পিতা, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি মিলে একত্রে বাস করতো। সমাজে পুরুষেরাই কর্তা ছিলেন। কিন্তু নারীদের স্থানও অতি উচ্চে ছিল। গৃহে সকলেই মাতার আদেশ মেনে চলতো। আর্যকন্যারা গৃহকর্ম ছাড়া লেখাপড়াও শিখতেন। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপলা প্রভৃতি বিদুষী মহিলা বেদমন্ত্র রচনা এবং শাস্ত্রালোচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নারীদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখা হতো না। উৎসবের সময় তারা সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতো। আর্যকন্যারা নিজেদের পছন্দ মতো বিবাহ করতে পারতো। কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা পরবর্তী কালে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

আর্যগণ প্রধানতঃ কৃষি ও পশুপালন করে জীবনধারণ করতো। গরু ছিল তাদের প্রধান সম্পত্তি। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল ফলমূল, শাকসব্জি ও দুধ। উৎসবের সময় তারা মাংস খেতো। এমন কি গো-মাংস খাওয়াও তাদের নিষিদ্ধ ছিল না। তারা তুলা ও পশম দিয়ে কাপড় বুনে পরতো এবং নানা রকম অলঙ্কার ব্যবহার করতো। পুরুষরা রথ চালনা, মৃগয়া এবং পাশাখেলা পছন্দ করতো। নারীরা নৃত্যগীত এবং বীণা বাজাতে ভালবাসতো।

ধর্ম-বিশ্বাস : আর্যরা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি (ব্রহ্মা), বিষ্ণু, রুদ্র (শিব), বায়ু, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করতো। তারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য করে জীবনধারণ করতো বলে বর্ষা এবং বজ্রের দেবতা ইন্দ্রই ছিলেন তাদের অধিক প্রিয়। শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্যও তাঁর নিকট প্রার্থনা জানানো হতো। আর্যদের আর একজন প্রধান দেবতা ছিলেন অগ্নি। তারা বিশ্বাস করতো যে, অগ্নিতে আহুতি দিলে তিনি তা অন্য দেবতাদের নিকট পৌঁছে দেন।

আর্যদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। দেবতাদের উদ্দেশে তারা যজ্ঞ করতো। সে সময় পুরোহিতরা আগুন জ্বেলে তাতে ঘি, মাংস সোমলতার রস আহুতি দিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করতেন।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা : আর্যরা গ্রামে বাস করতো। প্রত্যেক গ্রামে একজন নেতা থাকতেন, তাঁর নাম ছিল গ্রামণী। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে এক-একটি রাজ্য ছিল। তার উপর যিনি আধিপত্য করতেন তাঁকে বলা হতো বিশ্‌পতি এবং রাজন। তখন প্রত্যেক রাজ্যে প্রবীণ লোকদের একটি 'সভা' ছিল। এছাড়া জনসাধারণ একটি 'সমিতি'তে মিলিত হতো। রাজাকে 'সভা' এবং 'সমিতির' মতামত নিয়ে কাজ করতে হতো। তাই তিনি স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। বেদে রাজাবিহীন রাজ্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের বলা হতো 'গণরাজ্য'। এই সকল রাজ্যে প্রবীণ নেতারা শাসনকার্য চালাতেন।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে দেখা যায় যে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় রাজ্য এবং কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী নগরের সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁরা খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন তাঁরা রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তাঁদের ক্ষমতা প্রচার করতেন।

বেদ রচনা করে আর্য ঋষিরা আজও অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁদের গভীর চিন্তার ফলে উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যায়ও তাঁদের পারদর্শিতা ছিল। বস্তুতঃপক্ষে আর্য-ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরই প্রাচীন ভারতের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ২৫০০ ভারতে আর্যদের আগমন

" " ১২০০ ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ

খ. ভারতের মহাকাব্য

ইলিয়াড ও ওডিসির মতো প্রাচীনকালে ভারতেও দুখানি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ ও উৎসবের সময় চারণ কবিরা বড় বড় রাজা ও ঋষিদের কীর্তি-কলাপ গান করে শোনাতো। তারপর এগুলির কিছু অদল-বদল করে দুখানি মহাকাব্য

লেখা হয়। একখানির নাম **রামায়ণ**, অপরখানি **মহাভারত**। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথ অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী নিয়ে ভারতের আদিকবি **বাল্মীকি** রামায়ণ রচনা করেন। মহাভারতের রচয়িতা ছিলেন **বেদব্যাস**। তিনি সেকালের একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। হস্তিনাপুরের কুরুবংশের দুই শাখা—কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে মহাভারত লেখা হয়। দিল্লীর কিছু দূরে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে আঠারো দিন ব্যাপী দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন মহা-মহারথী ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ও আশীর্বাদ এবং ভীম ও অর্জুনের বীরত্বের জন্য পাণ্ডবদের জয় হয়। তাঁরা ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্র হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, "যা নেই ভারতে (অর্থাৎ মহাভারতে) তা নেই ভারতে।" মহাভারত সত্যই সকল জ্ঞানের আধার। তাই এই গ্রন্থখানিকে **পঞ্চম বেদ** বলা হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়াও মহাভারতে সেকালের মুনি-ঋষি ও রাজাদের বহু উপাখ্যান আছে। এর সবগুলিই অতি মনোরম। আর আছে শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত গীতার অমৃতবাণী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ গীতার কথা অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারত এত লোকপ্রিয় হয়েছিল যে, প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এই মহাগ্রন্থ দুখানি অনুবাদ করা হয়। যবদ্বীপ এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও রামায়ণ-মহাভারতের গল্প প্রচলিত ছিল। আমাদের বাংলাদেশের কবি **কৃত্তিবাস** এবং **কাশীরাম দাস** রামায়ণ ও মহাভারতের কথা লিখে অমর হয়ে আছেন। আজও আমরা তাঁদের লেখা বই আগ্রহ সহকারে পড়ি।

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ্। হিন্দুরা এই মহাকাব্য দুখানির নায়ক রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে পূজা করে। তাছাড়া এই গ্রন্থদুখানিতে অনেকগুলি মহৎ চরিত্র আছে। এই চরিত্রগুলি ভারতবাসীর জীবনের আদর্শ। রাম ও ভীষ্মের পিতৃভক্তি; যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞান; প্রজাদের প্রতি

রামের ভালবাসা ; ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জুন প্রভৃতির অপূর্ব ভ্রাতৃভক্তি ; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর পতিভক্তি ; একলব্য ও আরুণির গুরুভক্তি ; কর্ণের দান—এ সকলের কোনো তুলনা নেই। কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি প্রাচীনকালের অনেক বিখ্যাত কবি মহাভারত ও রামায়ণের গল্প নিয়ে সুন্দর সুন্দর কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী মহাকাব্য রচনা আরম্ভ

গ. জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা

আর্যদের ধর্ম-বিশ্বাস ও পূজা-পদ্ধতি প্রথমে খুব সরল ছিল। কিন্তু যতই দিন কেটে গেল, ততই তাদের মধ্যে যাগযজ্ঞই হয়ে উঠলো বড় ; আসল দেবতাদের প্রতি তাদের কোনো লক্ষ্য রইলো না। জ্ঞানী ও ধার্মিকরা এসব দেখে খুব নিন্দা করতে লাগলেন। বিশেষ করে যজ্ঞের সময়ে যে পশুবলি দেওয়া হতো তা দেখে তাঁরা খুবই কষ্টবোধ করতেন। এইজন্য অনেকে বৈদিক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। এই সময়ে কয়েকটি নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধধর্মই প্রধান।

জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠা : প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বর্ধমান (মহাবীর) জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি অভিজাত ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা বৈশালীর কাছে কুণ্ডপুর নামে এক ছোট রাজ্যে রাজত্ব করতেন। রাজপ্রাসাদের সুখ-সম্পদের প্রতি বর্ধমানের কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। এরপরে বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় 'জিন' এবং 'মহাবীর'। 'জীবে দয়া কর, সত্য কথা বলো এবং

জিতেন্দ্রিয় হও'—এই ছিল তাঁর প্রধান উপদেশ। তিরিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করার পর তিনি বিহারের পাবা গ্রামে দেহত্যাগ করেন। আজও ভারতের অনেক লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাবীরের উপদেশগুলি পালন করে থাকেন।



মহাবীর

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার: বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। তিনি মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। সেকালে নেপালের দক্ষিণে কপিলাবস্তু নামে একটি শহর ছিল। শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোদন সেখানে রাজত্ব করতেন। সিদ্ধার্থ ছিলেন তাঁর পুত্র।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা খুব কঠিন। কথিত আছে যে, একবার নগর ভ্রমণে বার হয়ে সিদ্ধার্থ একজন বৃদ্ধ, একজন রুগ্ণ ব্যক্তি, একটি মৃতদেহ এবং একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান। তখন তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর একটি পুত্র হয়। তিনি দেখলেন যে, ক্রমেই তিনি সংসারে জড়িয়ে পড়ছেন। শেষে একদিন গভীর রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

এরপরে সিদ্ধার্থ বিহারের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেন। কিন্তু শান্তি পেলেন না। তারপর

গয়ার কাছে এক গ্রামে গিয়ে তিনি অনাহারে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভ হলো না। তখন তিনি তপস্যা ছেড়ে স্নান করলেন। এই সময় সুজাতা নামে একজন ভক্তিমতী গ্রাম্য রমণী তাঁকে পায়েস খেতে দেন। তাই খেয়ে সুস্থ হয়ে তিনি বৌদ্ধ-গয়াতে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এবার তিনি প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেলেন। তখন থেকেই তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী বলে সকলের কাছে পরিচিত হন।



বুদ্ধদেব

কাশীর কাছে মৃগ-দাবে (এখনকার সারনাথে) বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নগরে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আশি বছর বয়সে উত্তর-প্রদেশে গোরখপুর জেলার কুশীনগরে বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধদেব বেদ মানতেন না ; যাগযজ্ঞ, পশুবলিরও নিন্দা করতেন। সংসারের ভোগবিলাসও যেমন তিনি পছন্দ করতেন না, তেমনি শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করতেও তিনি বারণ করতেন। তিনি বলতেন, মাঝামাঝি পথই শ্রেষ্ঠ পথ। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য তিনি সকলকে সব রকম কামনা-বাসনা এবং জীব-হিংসা ত্যাগ করে সজ্জীবন-যাপন করতে উপদেশ দিতেন। মুক্তিলাভের জন্য তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন তাকে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'।

বুদ্ধদেব তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে একসঙ্গে বাস করতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই রকম দলকে বলা হত **সঙ্ঘ**। কোনো লোকেরই বুদ্ধদেবের শিষ্য হতে বাধা ছিল না। এঁদের মধ্যে যেমন বিম্বিসারের মতো রাজা, অনাথপিণ্ডদের মতো ধনী বণিক, এবং সারিপুত্ত ও মোগ্গলায়নের মতো উচ্চবংশের সন্তান ছিলেন, তেমনি আবার অনেক দীন-দরিদ্রও ছিলেন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহে মিলিত হন এবং তাঁর উপদেশগুলি আবৃত্তি করেন। এই সকল উপদেশ পরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থগুলির নাম **ত্রিপিটক**।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ পূঃ ৫৪৪—বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ
" ৫২৭—মহাবীরের নির্বাণ লাভ

ঘ. ভারতের সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাস

রামায়ণ ও মহাভারত পড়লে জানা যায় যে, প্রাচীন ইক্ষ্বাকু ও কুরুবংশের শক্তিশালী রাজারা সসাগরা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতেন। কিন্তু এ হলো কবির বর্ণনা। ইতিহাসে যাঁকে আমরা ভারতের প্রথম একচ্ছত্র সম্রাট বলে জানি তিনি হলেন মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা **চন্দ্রগুপ্ত**। খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৩২৪ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় চব্বিশ বছর ধরে তিনি প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনকাহিনী অতি বিচিত্র। তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা বিহারের উত্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করতেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতা শত্রুদের হাতে নিহত হন। তখন তাঁর মা পাটলিপুত্রে পালিয়ে আসেন। সেখানে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়।

আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাবে যুদ্ধ করছিলেন তখন চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বোধ হয় গ্রীকদের যুদ্ধকৌশল শেখবার জন্যই পাঞ্জাবে এসেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে আলেকজাণ্ডার চন্দ্রগুপ্তের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করবার আদেশ দেন।

চন্দ্রগুপ্ত পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিন্ধ্য পর্বতের কাছে এসে উপস্থিত হন। এর কিছু পরে চাণক্য নামে একজন কূটনীতিবিদ্ ব্রাহ্মণের সাথে তাঁর দেখা হয়। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি মগধে নন্দবংশের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের পরাভূত করে পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত মগধ রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেছিলেন। এতে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়েছিল। কারণ প্রথম থেকেই তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্যের রাজা হন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর যখন তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি শুরু হয়েছিল, তখন সুযোগ বুঝে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। এরপরে তিনি পশ্চিম ভারতে আরবসাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেন। তখন উত্তর ভারতে তাঁর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না। এবার দাক্ষিণাত্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সেখানে তিনি মহীশূরের দক্ষিণ-সীমান্ত পর্যন্ত সকল দেশ জয় করেন। এইভাবে চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতের সম্রাট হন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকে সিরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুউকাস্ পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। সেলুউকাস্ তাঁকে পাঞ্জাবের রাজা বলে স্বীকার তো করলেনই, তাছাড়া আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের অধিকাংশ তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। যুদ্ধের পর চন্দ্রগুপ্ত ও সেলিউকাসের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন গ্রীকদূত পাঠিয়েছিলেন ; তাঁর নাম মেগাস্থিনিস্।

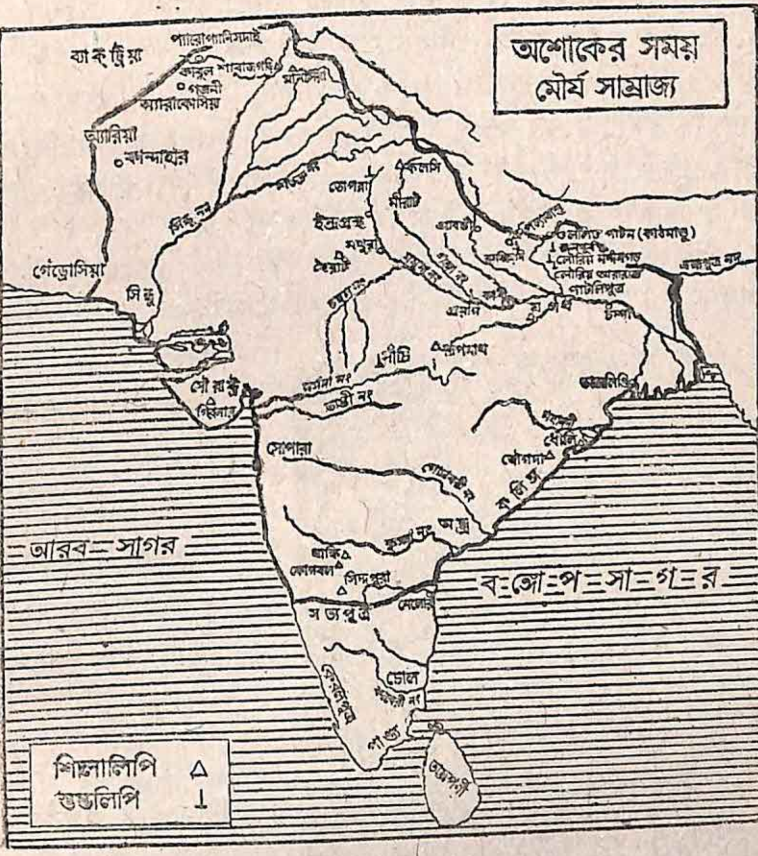
চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকেই তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর অপর এক নাম ছিল কৌটিল্য। কিভাবে রাজকার্য পরিচালনা করা উচিত সে সম্বন্ধে কৌটিল্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম 'অর্থশাস্ত্র'। এই গ্রন্থখানি ও মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। তিনি

রাজপুত ও রাজ-প্রতিনিধিদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ছিল—ঠিক যেমনটি আমরা এখন দেখতে পাই। রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনভার ছিল একটি নগর-সভার উপর। এই সভার সদস্যরা জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখতেন; সকল রকম কেনা-বেচার তত্ত্বাবধান করতেন এবং বিদেশীদের সুখ-সুবিধার দিকেও দৃষ্টি দিতেন। সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত একটি বিশাল চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। তার পরিচালনার ভারও একটি সভার উপর ন্যস্ত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার এবং পৌত্র অশোক গ্রীক রাজাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতেন। বিন্দুসার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু অশোক সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি তাঁর ভাইদের পরাজিত ও নিহত করে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু এই কাহিনীটি অনেকে বিশ্বাস করেন না।

অশোকের অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকেই আমরা তাঁর রাজত্বের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারি। প্রথম জীবনে অশোক প্রাচীন যুগের অন্যান্য রাজাদের মতই আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসতেন। সে সময় এখনকার উড়িষ্যা ও অন্ধ্রদেশের কিছুটা জুড়ে কলিঙ্গ নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। রাজা হবার বারো বছর পর অশোক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই রাজ্যটি আক্রমণ করলেন। কলিঙ্গ বিজিত হল। ফলে তখন মৌর্যসাম্রাজ্য কাবুল থেকে বঙ্গোপসাগর এবং হিমালয় থেকে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়েছিল। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড এবং কলিঙ্গবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে অশোক মনে বড় ব্যথা পান এবং তাঁর কৃতকার্যের জন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন। তখন থেকে তাঁর জীবনের ধারা বদলে গেল। তিনি স্থির করলেন আর কখনো যুদ্ধ করবেন না। এর কিছুকাল পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস ও আমোদ-প্রমোদ তিনি ছেড়ে দিলেন। মৃগয়াযাত্রা বন্ধ হয়। রাজার রন্ধনশালায় পশুহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে অশোকের একমাত্র ধ্যানধারণা হলো কি করে সকল জীবজগতের মঙ্গল সাধন করা যায়।

প্রজাদের মনে যাতে ধর্মভাব জেগে ওঠে আর সকলে যাতে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে নানা



জায়গায় ঘুরে ঘুরে সকলকে অহিংসা ও শান্তির বাণী শোনাতে লাগলেন। তাছাড়া তিনি বড় বড় রাজকর্মচারীদের আদেশ দিলেন, তাঁরাও যেন নিজেদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকদের ধর্ম উপদেশ দেন। যাতে ধর্মোপদেশগুলি লোকের চোখে পড়ে, সেজন্য তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বহুস্থানে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথরের ফলকে ও শিলাস্তম্ভে সেগুলি খোদাই করিয়ে রেখেছিলেন। তিনি এই সব লিপির নাম দিয়েছিলেন 'ধর্মলিপি'।

অন্যরাজ্য জয় করতে যেখানে তিনি সৈন্য পাঠাতেন এখন তিনি

সেখানে পাঠাতে লাগলেন ধর্ম-প্রচারক। অশোক এর নাম দিয়েছিলেন ধর্মবিজয়। দক্ষিণ ভারতে তখন চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও সত্যপুত্র নামে চারটি ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোকের দূতেরা এই সকল রাজ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এছাড়া ভারতের বাইরে সিংহল (শ্রীলংকা), পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও গ্রীসদেশেও অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। সিংহলে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা। এইভাবে অশোকের চেষ্টায় ভারতের বাইরে বুদ্ধের বাণী প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করলেও অশোক কোনোরকম গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। তিনি সকল ধর্মের লোককে শ্রদ্ধা করতেন এবং বলতেন যে, নিজের ধর্মের প্রশংসা ও অন্য ধর্মের নিন্দা করা উচিত নয়। পরস্পরের ধর্মমত শুনে তার সার সংগ্রহ করাই সকলের কর্তব্য।



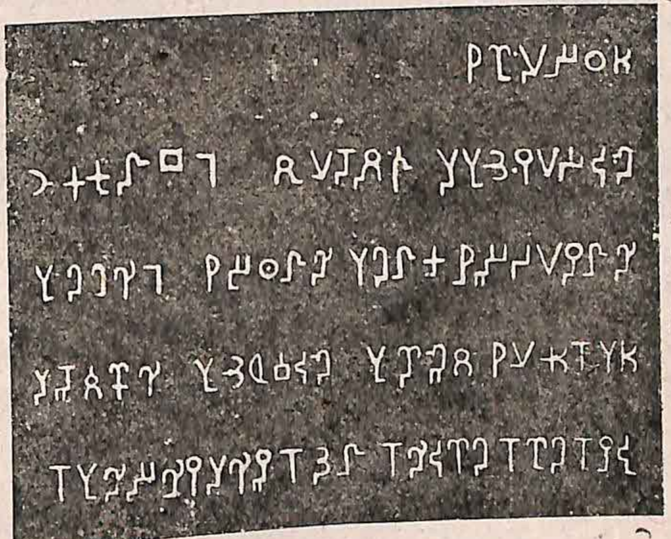
অশোক

মানুষ ও সাধারণ জীবজন্তুর দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য অশোকের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রজাদের উপর যাতে কোনোরূপ অন্যায়-অবিচার না হয় তা দেখবার জন্য তিনি একদল শান্তস্বভাবের কর্মচারী গ্রামে ও নগরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। অযথা জীবহত্যাও তিনি ক্রমে বন্ধ করে দিলেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তার পাশে গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করেন। জলের অভাব দূর করার জন্য কূপ খনন করিয়ে দেন। এছাড়া মানুষ

এবং পশু উভয়েরই চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যাতে ঔষধের অভাব না হয় সেজন্য ঔষধের নানারকম লতা ও গুল্ম রোপণ করিয়েছিলেন। শুধু নিজের দেশের জন্যই তিনি এসব করেননি, বিদেশেও তাঁর দূতরা এই সকল কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকা সত্ত্বেও অশোক নতুন রাজ্যজয়ের লোভ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণিজগতের কল্যাণবিধানের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁকে কোনোরকম স্পর্শ করতে পারেনি। এতগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ আমরা পৃথিবীর আর কোনও রাজার মধ্যে দেখি না। তাই অশোককে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা বললেও খুব বেশি বলা হয় না।

অশোকের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই মৌর্যসাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। এখন গ্রীকরা আবার আফগানিস্তান, বালুচিস্তান,



ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা অশোকের শিলালিপির অংশ

পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করে। তারা পাটলিপুত্র পর্যন্ত ধেয়ে এসেছিল কিন্তু তখনকার মগধের রাজা শুঙ্গ বংশের পুষ্যমিত্রের হাতে

পরাজিত হয়ে তাদের ফিরে যেতে হল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিদেশী শাসন কায়েম হয়ে বসল। গ্রীকদের তাড়িয়ে শকজাতির লোকেরা সিন্ধু-উপত্যকা এবং ক্রমে পশ্চিম ভারতের মালব, সুরাষ্ট্র এবং মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করে। অবশেষে আসে কুষাণেরা। তারা প্রথমে মধ্য এশিয়ায় বাস করতো। তারপর আফগানিস্তান দখল করে তারা ভারতে প্রবেশ করে। কুষাণদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তিনি কাবুল উপত্যকা ও কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্যের উপর রাজত্ব করতেন। একবার চীনের সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় তিনি পূর্ব তুর্কীস্থানের কিছু অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যও শেষ পর্যন্ত টিকলো না। কণিষ্কের রাজত্বের দু'শ বছর পরে আবার মগধের সুদিন ফিরে আসে। তখন সেখানে গুপ্তবংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। গুপ্তরাজারা উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নামও ছিল চন্দ্রগুপ্ত। তিনি লিচ্ছবী বংশীয় একজন রাজকন্যাকে বিবাহ করে মগধের রাজশক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সভাকবি হরিষেণের প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত একজন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাছাড়া তিনি কবিতা লিখতেন, ভাল বীণা বাজাতেন এবং নানা শাস্ত্রে সু-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের পরাজিত করে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূল ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে তিনি বারোজন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা অধীনতা স্বীকার করার পর তিনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন। সমুদ্রগুপ্তের বল ও বীর্য দেখে একদিকে পূর্ববঙ্গ, আসাম, নেপাল এবং অন্যদিকে পাঞ্জাব,



বীণাবাদন-রত সমুদ্রগুপ্ত

রাজপুতানা ও পূর্ব মালবের ছোট ছোট রাজ্যগুলি বিনা যুদ্ধেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম ভারতের শক রাজারা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কুষাণ রাজারা এবং সিংহলের রাজা মেঘবর্ণও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন। অশোকের পর আর কোনো ভারতীয় রাজা এত শক্তিশালী হতে পারেননি। দিগ্বিজয় শেষ করে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার মতই তেজস্বী ও বীর ছিলেন। তিনি মালবের শক রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে আরব সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রসারিত করেন। এর পর তিনি মালবদেশের উজ্জয়িনী নগরে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' অর্থাৎ সূর্যের মত তেজস্বী উপাধি নিয়েছিলেন। বিক্রমাদিত্য নামে একজন খুব বীর রাজার সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনিও শকদের পরাজিত করেছিলেন এবং উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। তাঁর সভায় কালিদাস, বরাহ-মিহির প্রভৃতি ন'জন বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। এদের বলা হত 'নবরত্ন'। অনেকে বলেন, গল্পের বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেউ নন।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত সম্রাট হন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে বর্বর হূণজাতি মধ্য এশিয়া থেকে এসে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু রাজকুমার স্কন্দগুপ্তের সাহস ও বীর্যের কাছে তাদের হার মানতে হয়। পিতার মৃত্যুর পরে স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন গুপ্ত সাম্রাজ্যের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য ক্রমে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ পূঃ	আনুমানিক	৩২৪	মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
"	"	৩০৫	চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুউকাসের যুদ্ধ
"	"	২৭২-৩২	অশোকের রাজত্বকাল
"	"	১৮৭	মৌর্যবংশের পতন

স্মরণীয় তারিখ

খ্রীস্টাব্দ ৭৮ কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণ ও শকাব্দের আরম্ভ
,, ৩১৯-২০ গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা, গুপ্তাব্দের আরম্ভ
,, ৩৩০ সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ
,, ৩৮০ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ
,, ৫৫০ গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন

ঙ. বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ভারতের আদি প্রস্তর-যুগ থেকেই এখানে মানুষের বসতি ছিল। এরা ক্রমে তামা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল। বৈদিক যুগের শেষের দিকে পুণ্ড্র নামে একটি উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তারা উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলে বাস করতো। তাদের নাম থেকে এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল পুণ্ড্রদেশ এবং পুণ্ড্রবর্ধন।

আর্যরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের অত্যন্ত অপবিত্র মনে করতো। তাই যদি কোনো আর্য এদেশে আসতো তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। মহাকাব্যের যুগে বাংলাদেশে কতকগুলি জনপদ গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একটির নাম ছিল বঙ্গ। এই সময় থেকে আর্যদের এদেশে আসতে আর কোন বাধা ছিল না। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দশরথ বঙ্গ জয় করেছিলেন। মহাভারত থেকে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ, ভীম বঙ্গদেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিলেন।

বাংলাদেশে আর্যসভ্যতার বিস্তার হতে বহুকাল কেটে গিয়েছিল। জৈনদের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মহাবীর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে রাঢ় দেশে (বর্ধমান-মেদিনীপুর অঞ্চল) ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। সেখানে তখন কোনো রাস্তাঘাট ছিল না। অধিবাসীরাও যে সভ্য ছিল তাও মনে হয় না। তারা মহাবীরের বিরুদ্ধে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু শ্রীলংকার বৌদ্ধদের লেখা একখানি প্রাচীন গ্রন্থে অন্য রকম কথা আছে। মহাবীরের সমসাময়িক বুদ্ধদেবের সময় রাঢ় দেশে সিংহবাহু নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর বিজয়সিংহ

নামে এক পুত্র ছিল। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, তাই তাঁর পিতা তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেন। বিজয়সিংহ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজে করে লঙ্কা দ্বীপে আসেন এবং সেখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরেরা পরবর্তীকালে তাঁর নাম স্মরণীয় করতে লঙ্কাদ্বীপের নাম দিয়েছিল সিংহল। এই কাহিনীটি সম্ভবত সত্যি নয়।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে গঙ্গা ও পদ্মানদীর নিম্ন উপত্যকায় 'গঙ্গারিডই' নামে একটি জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের একটি বিশাল হস্তিবাহিনী ছিল। নন্দবংশের সর্বশেষ রাজা ধননন্দের সঙ্গে এদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তারা নন্দরাজের সঙ্গে একত্র হয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার জন্য পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিল।

নন্দবংশের পর মৌর্যবংশের রাজারা সম্ভবত বঙ্গদেশ জয় করে-ছিলেন। এই সময় বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল পুণ্ড্র নগরে। সেখানে দুর্ভিক্ষের সময় চাষীদের শস্য ধার দেবার জন্য একটি বড় রকমের শস্যাগার ছিল। কুষাণ যুগে গঙ্গার মোহনায় আবার একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এর রাজধানীর নাম ছিল 'গঙ্গে'। সেখানে অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন কাপড় তৈরি হতো এবং রোমের বড়লোকরা তা খুব পছন্দ করতো। এর প্রায় একশ বছর পরে গুপ্তবংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। বাংলাদেশের বীরগণ চন্দ্র নামে একজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অনেকে বলেন তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাংলাদেশে গুপ্ত-রাজত্ব প্রায় দু'শ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তারপর এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন।

চ. বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

ভারতবর্ষের উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্বত, অন্য তিনদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। প্রাচীনকালে এই পর্বত ও সমুদ্র অতিক্রম করে অন্যদেশে যাতায়াত করা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু কোনো রকম

বাধা-বিঘ্নই সে যুগের ভারতবাসীদের নিজেদের দেশের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি। অতি প্রাচীনকাল থেকে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দূর দূর দেশে যাতায়াত করতো। ক্রমে এর সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্ম-প্রচার করতেও শুরু করেছিল। মৌর্যরাজ অশোকই সর্ব-প্রথম দূত পাঠিয়ে গ্রীস, মিশর, পশ্চিম এশিয়া এবং সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করিয়েছিলেন।

এরপর কুষাণ রাজাদের রাজত্বকালে ভারতবাসীরা একদিকে রোম-সাম্রাজ্য এবং অন্যদিকে মধ্য এশিয়া ও চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করে। এই একই সময় ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামেও ভারতীয় বণিকদের যাতায়াতের কথা জানা যায়। গুপ্তবংশের রাজাদের সময় থেকে এই সকল দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে।

ভারতবাসীরা ক্রমে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জায়গায় জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। তখন এই দুটি অঞ্চলের রাজারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় নাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি হিন্দুদেবতা, অথবা বুদ্ধদেবের পূজা করতেন। ভারতীয় আদর্শে তাঁরা তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁদের সমাজ-ব্যবস্থাও হিন্দুদের অনুকরণে গঠিত হয়। সেখানকার সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত, লেখাও হতো প্রাচীন ভারতীয় বর্ণ-লিপিতে। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল।

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুষাণ যুগে সর্বপ্রথম সেখানকার যাযাবর জাতিদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। ক্রমে সেখানে কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সকল রাজ্যের রাজারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। রাজ্যগুলির মধ্যে দক্ষিণ তুর্কিস্তানে অবস্থিত খোটান ও উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত কুচির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ যখন মধ্য এশিয়া হয়ে স্বদেশে ফিরে যান, তখন তিনি এই অঞ্চলে একশটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। মধ্য এশিয়া থেকেই

বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর সেখান থেকে মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া এবং জাপানে। এর ফলে বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়।

ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের কাহিনীর প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা প্রয়োজন। আমরা যেমন অন্যদেশকে অনেক কিছু দিয়েছি তেমনি তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। পণ্ডিতরা বলেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পারসিকদের অনুকরণে তাঁর শাসন-পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। মৌর্য স্থাপত্যকলায়ও পারসিক প্রভাব দেখা যায়। আমাদের সাহিত্য, জ্যোতিষ শাস্ত্র, এবং স্থাপত্যকলায় গ্রীক ও রোমানদের কিছু কিছু দান আছে।

বাইরের দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের যতই বেশি পরিচয় হতে থাকে, ততই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। এর ফলে ভারতের ধনসম্পদ্ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হলো কাদের? বণিকদের নিয়ে ভারতীয় সমাজে একটি শক্তিশালী বণিকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। রাজারাও এদের খাতির করে চলতেন। কিন্তু এই সময় পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে যেমন দেখা যায় সেই রকম রাজা, রাজকর্মচারী, অভিজাত বংশের লোক এবং ধনী ব্যক্তিরাই সকল রকম সুখ-সম্পদ্ ভোগ করতেন। যারা গরীব চাষী ও শ্রমিক ছিল তারা গরীবই থেকে গেল।

ছ. মেগাস্থিনিস্ ও ফা-হিয়েনের বিবরণী

প্রাচীন যুগে কয়েকজন বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস্ এবং চীনের পর্যটক ফা-হিয়েনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেগাস্থিনিস্ মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। আর ফা-হিয়েন এদেশে এসেছিলেন গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে। তিনি প্রায় ছ'বছর ধরে এদেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন।

মেগাস্থিনিস্ লিখেছেন, এদেশের লোক সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ; (২) কৃষক; (৩) শিকারী ও

পশুপালক ; (৪) শিল্পী ও ব্যবসায়ী ; (৫) যোদ্ধা ; (৬) পরিদর্শক এবং (৭) অমাত্য। এরা নিজেদের শ্রেণীর বাইরে বিয়ে করতো না, এবং এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর মানুষের বৃত্তিও গ্রহণ করতো না। সমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের খুব সম্মান ছিল। লোকে কৃষকদের পরোপকারী বলে মনে করতো। তাই শস্যক্ষেত্রের কাছে যুদ্ধবিগ্রহ হতো না। রাজদরবারে শিল্পীদের সমাদর ছিল।

মেগাস্থিনিস্ বলেন, ভারতবাসীরা সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতো। সকলে সকলকে বিশ্বাস করতো, তাই মামলা-মকদ্দমা খুব কম হতো। চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিল না বললেই হয় ; সকলে নির্ভয়ে দরজা খুলে ঘুমাতে পারতো। কেউ অপরাধ করলে কঠিন শাস্তি পেতো। এমন কি কোনো কোনো অপরাধীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেওয়া হতো। রাজা প্রজাদের সুখ-শান্তির দিকে দৃষ্টি রাখতেন। রাজধানীতে অনেক বিদেশী লোক বাস করতো। তাদের দেখাশোনা করবার জন্য একদল বিশেষ কর্মচারী ছিল।

ফা-হিয়েনও ভারতবাসীর চরিত্র এবং রীতিনীতির খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, তাদের খুব ধর্মজ্ঞান ছিল ; তারা কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতো না ; প্রতারণারও আশ্রয় নিতো না। লোকে ইচ্ছামত যেখানে খুশি সেখানে যাতায়াত করতে পারতো। পথে চোর-ডাকাতের কোনো ভয় ছিল না। রাজারা জায়গায় জায়গায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও পান্থশালার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে একটি খুব বড় দাতব্য চিকিৎসালয় দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। এর সকল খরচ-পত্র দিত সেখানকার ধনীলোকেরা। পান্থশালায় পথিকেরা বিশ্রামের জন্য বাসস্থান, শয্যা, আহার এবং পানীয় বিনামূল্যে পেত।

গুপ্তযুগের লোকেরা মদ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন খেতো না। কেবল নীচ জাতির লোক এবং চণ্ডালেরা পশু হত্যা করতো। চণ্ডালদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করা হতো। তারা শহরের বাইরে বাস করতো, শহরে প্রবেশ করতে হলে কাঠি বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিতো যাতে অন্য লোকের গায়ে ছোঁয়া না লাগে। গুপ্ত যুগে অপরাধীদের মৌর্যযুগের মতো কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো না।

মেগাস্থিনিস্ ও ফা-হিয়েন সেকালের ভারতবাসীদের সাধুতা সম্বন্ধে কিছুটা অত্যুক্তি করেছেন। আমরা সেকালের শিলালিপি এবং বই পড়ে জানতে পারি, আসলে ভারতীয়রা এতটা ভালো ছিল না। শাসনকর্তারাও সাধারণ লোকদের উপর নানা রকম উৎপীড়ন করতেন।

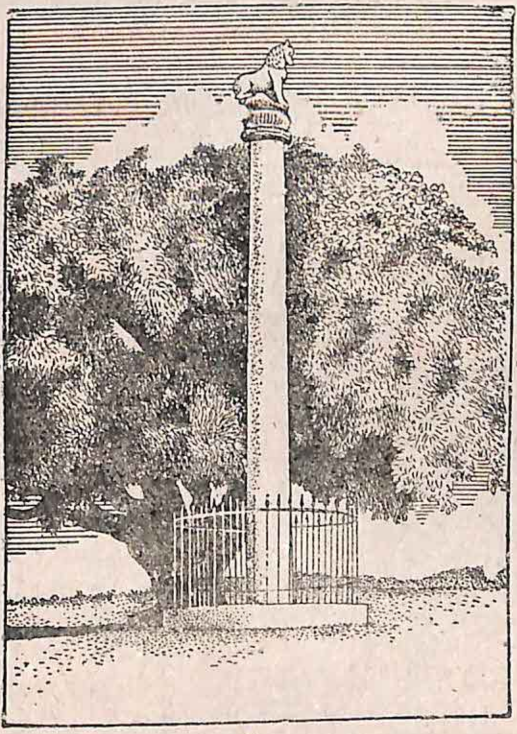
স্মরণীয় তারিখ

খ্রীঃ পূঃ আঃ ৩০৫ মেগাস্থিনিসের পাটলিপুত্রে দৌত্য

খ্রীষ্টীয় ৪০৫-৪১১ ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ

জ. প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি

১। **স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা :** আমরা এর আগে দেখেছি যে, প্রাচীন সিন্ধুতীরবাসিগণ বাড়িঘর নির্মাণ, মূর্তি গড়ার কাজ এবং



অশোকের শিলাস্তম্ভ

চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। তার বহুকাল পরে এই সকল

শিল্পের কাজ দেখা যায় মৌর্যযুগে। চন্দ্রগুপ্ত কাঠ দিয়ে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তার সাজসজ্জা ও জাঁকজমক দেখে গ্রীকরা মোহিত হয়েছিল। অশোকই প্রথম পাথর দিয়ে প্রাসাদ, স্তম্ভ এবং জীবজন্তুর মূর্তি ইত্যাদি নির্মাণ করাতে শুরু করেন। পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদের সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখে ফা-হিয়েন মনে করেছিলেন এটি মানুষের তৈরি নয়, দানবের তৈরি। অশোকের সময় স্থাপত্য-শিল্পের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তাঁর শিলা-স্তম্ভ ও তার উপরের জীবজন্তুর মূর্তিগুলি দেখলে তা বোঝা যায়।

কুষাণ যুগে (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দী) রাজারা তক্ষশীলা এবং মথুরা—এই শহর দুটিতে সুন্দর সুন্দর মঠ, মন্দির, বুদ্ধদেবের মূর্তি এবং স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ভারতীয় ও গ্রীক স্থাপত্যের রীতি মিলিয়ে এগুলি নির্মিত হয়। ইতিহাসে এগুলি গান্ধার শিল্প বলে পরিচিত। তক্ষশীলা ছিল গান্ধারের রাজধানী।

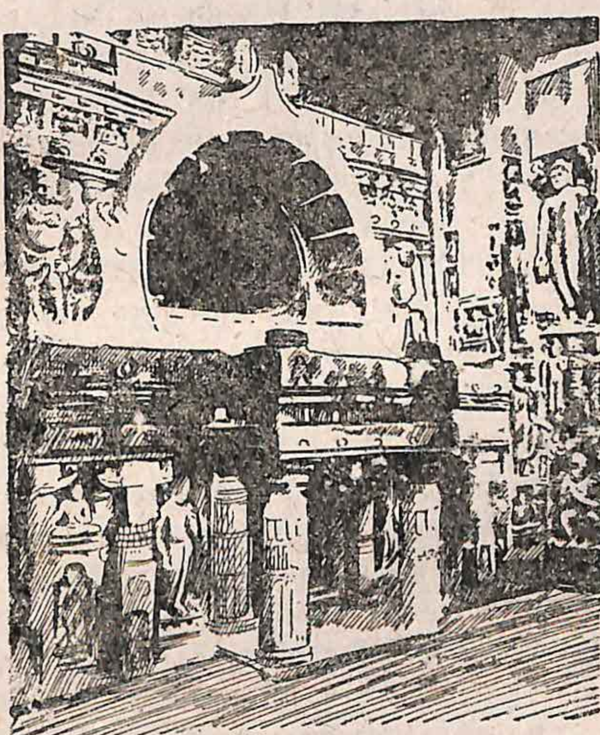
গুপ্ত যুগেই ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছিল। সেকালের যে সকল মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির উপর নানা রকমের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায়। মূর্তিগুলি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে গড়া, এতে কোনো বিদেশী প্রভাব ছিল না। এই যুগের একটি অপূর্ব সৃষ্টি অজন্তা গুহার চিত্রাবলী। বৌদ্ধ শ্রমণদের থাকবার জন্য মহারাষ্ট্রের একটি পাহাড়ের গা কেটে সারি সারি কৃত্রিম গুহা তৈরি



অজন্তা গুহার চিত্র

করা হয়েছিল। এইসব গুহাতে ছিল বড়ো বড়ো হলঘর, বারান্দা, বিরাট বিরাট স্তম্ভ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকার এবং পূজোর ঘর। এই সকল ঘরগুলির দেওয়ালে রং ও তুলির সাহায্যে সেকালের শিল্পীরা বুদ্ধের জীবনী এবং রাজসভার দৃশ্য প্রভৃতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ছবিগুলি দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এগুলির সৌন্দর্যের খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

২। **সাহিত্য ঃ** বৈদিক যুগের শেষদিকে নানাধরনের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো উপনিষদ্ নামে কতকগুলি গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ রচনা করে ঋষিরা বলতে



অজন্তা গুহা

চাইছিলেন যে, ঈশ্বর হলেন এক এবং অদ্বিতীয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতেই তাঁরই মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে।

এদিকে দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন আর্যভাষার পরিবর্তন হচ্ছিলো।

তক্ষশীলার পাণিনি নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রচলিত আর্যভাষার সংস্কার সাধনের জন্য একখানি পুস্তক রচনা করেন। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে এইভাবে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। তাঁর লেখা বইখানি আমাদের দেশের সর্বপ্রথম ব্যাকরণ।

পাণিনির সময় সম্ভবত মহাকাব্য রচনা শুরু হয়েছিল। তারপরে মৌর্যযুগে রামায়ণ ও মহাভারত লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। আরো কিছুকাল পরে কণিষ্কের সভাপণ্ডিত অশ্বঘোষ রামায়ণের অনুকরণে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বুদ্ধচরিত' রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছিল গুপ্তযুগে। প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা 'শকুন্তলা' নাটকখানি দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করেছে। কালিদাসের লেখা 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি কাব্যগুলিও সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। শূদ্রক, বিশাখদত্ত, ভারবি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকারেরাও গুপ্তযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

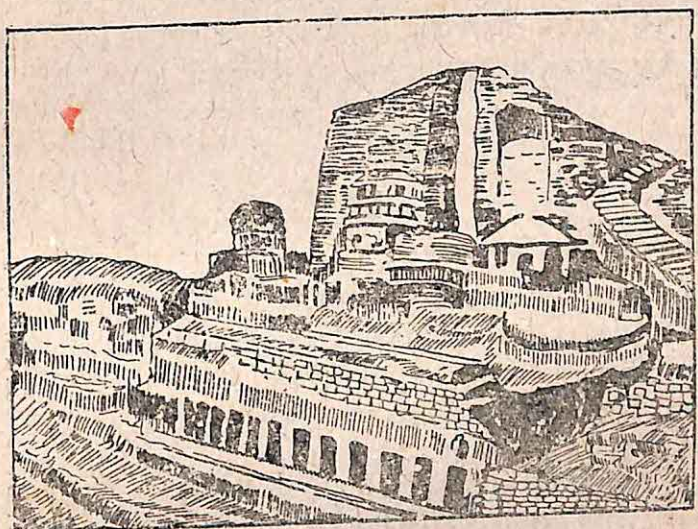
নাটক এবং কাব্য ছাড়া অনেক 'স্মৃতি' এবং পুরাণও এই সময়ে সংকলিত হয়েছিল। গৃহস্থের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত—স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে সে বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। পুরাণগুলি থেকে দেব-দেবীর উপাখ্যান, প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস এবং নানারকম আচার-ব্যবহার ও ধর্ম-কর্মের কথা জানা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত আগে ছিল অনেক ছোটো। পরে এতে আরো অনেক নতুন বিষয় যোগ করা হয়। এখন আমরা যে বড় রামায়ণ ও মহাভারত দেখতে পাই তার সংকলনও গুপ্তযুগে হয়েছিল।

৩। বিজ্ঞান-চর্চা: শুধু সাহিত্য, চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্যেই নয়, গুপ্তযুগে বিজ্ঞানচর্চারও খুব উন্নতি হয়েছিল। ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর্যভট্ট প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সে নিজের চারদিকে ঘুরছে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় তাও প্রথম আবিষ্কার করেন বরাহমিহির নামে সে যুগের আর একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। ভারতীয় জ্যোতিষীরা কোনো কোনো বিষয়ে গ্রীকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাই তাঁরা প্রাচীন গ্রীক্ জ্যোতিষীদের ঋষির মতো শ্রদ্ধা করতেন। গণিতশাস্ত্রে যে দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার করা

হয় তাও হিন্দুরা আবিষ্কার করে। এই সময়ে বীজগণিতে বহু প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত নামে আর একজন পণ্ডিত।

চিকিৎসা ও রসায়নবিদ্যার গোড়াপত্তন করেছিলেন চরক এবং সুশ্রুত। চরক ছিলেন কণিষ্কের রাজবৈদ্য। গুপ্তযুগের চিকিৎসকরা মৃত জীবজন্তু কেটে দেখতেন তাদের শরীরে কোথায় কি আছে। আর মোমের মানুষ তৈরি করে তার ওপর ছুরি চালিয়ে তাঁরা অস্ত্রোপ্রচারে হাত পাকাতেন।

৪। **শিক্ষাব্যবস্থা ঃ** বৈদিক যুগে ছাত্রদের গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে হতো। তারপরে মঠ, মন্দির প্রভৃতিতেও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। ক্রমে ভারতের নানাস্থানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল।

উপনিষদের যুগ থেকে তক্ষশীলা শহরটি বিদ্যাচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সেখানে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, চিকিৎসাশাস্ত্র (আয়ুর্বেদ) এবং ধনুর্বেদ প্রভৃতি শেখানো হতো। এটি ছিল হিন্দুদের বিশ্ববিদ্যালয়।

তক্ষশীলার খ্যাতি ম্লান করে দিয়েছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। বিহারের রাজগীরের কাছে এটি অবস্থিত ছিল। গুপ্তযুগের শেষের দিকে এখানে একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এর চরম উন্নতি হয়েছিল কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ে (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ)। তখন এখানে দশ হাজার ছাত্র একসঙ্গে শিক্ষালাভ করতো। শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার। এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে মেধাবী ছাত্ররা এখানে এসে মিলিত হতো। দ্বার-পণ্ডিতদের কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে এখানে কেউ প্রবেশলাভ করতে পারতো না। বৌদ্ধশাস্ত্র ছাড়াও এখানে বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। হর্ষবর্ধনের সময়ে নালন্দার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন শীলভদ্র। তিনি বাঙালী ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রশ্নাবলী

বিষয়মুখী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। আর্যরা প্রথম ভারতে আসে কবে ?
২। উত্তর ভারতের আর এক নাম কি ও কেন ?
৩। বেদ কাকে বলে ? বেদ কয়প্রকার ও কি কি ?
৪। সর্বপ্রথম কোন্ বেদ রচিত হয় ?
৫। চতুরাশ্রম কি কি ?
৬। আর্যসমাজে কয়েকজন বিদুষী মহিলার নাম কর।
৭। আর্যদের প্রধান খাদ্য কি ছিল ?
৮। আর্যরা কোন্ কোন্ দেবতার পূজো করত ?
৯। গ্রামণী, বিশপতি এবং রাজন্ কাদের বলা হোত ?
১০। সভা ও সমিতি কাকে বলে ?
১১। প্রাচীন ভারতের দুটি মহাকাব্যের নাম কি ?
১২। আমাদের দেশের মহাভারত সম্বন্ধে একটা প্রচলিত প্রবাদবাক্য কি ?
১৩। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্রের পরিচয় দাও।
১৪। রামায়ণ ও মহাভারতকে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ্ বলা হয় কেন ?
১৫। রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতার নাম কি ?

১৬। জৈনধর্মের প্রচারক কে ছিলেন ?
১৭। মহাবীরের প্রধান উপদেশ কি ছিল ?
১৮। মহাবীর কোন্ গ্রামে দেহত্যাগ করেন ?
১৯। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
২০। সিদ্ধার্থ নগর-ভ্রমণে বের হয়ে কি কি দৃশ্য দেখেন ?
২১। বুদ্ধদেব কোথায় তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার করেন ?
২২। বুদ্ধদেব কোথায় দেহত্যাগ করেন ?
২৩। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কাকে বলে ?
২৪। বুদ্ধদেবের কয়েকজন শিষ্যের নাম কর।
২৫। 'ত্রিপিটক' কি ?
২৬। অশোক তাঁর উপদেশগুলি কোথায় খোদাই করে রেখেছিলেন ?
২৭। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
২৮। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে কেন দেখা করেন ?
২৯। চাণক্য কে ছিলেন ? তাঁর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্তের কি সুবিধা হয়েছিল ?
৩০। নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
৩১। সেলুকাস কে ?
৩২। চন্দ্রগুপ্তের সভায় কে গ্রীকদূত পাঠিয়েছিলেন ? তাঁর নাম কি ?
৩৩। ধর্মবিজয় কাকে বলে ? কে এর প্রবর্তন করেন ?
৩৪। কুষাণ কারা ? তারা কিভাবে ভারতে প্রবেশ করে ?
৩৫। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম কি ?
৩৬। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?
৩৭। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ?
৩৮। 'নবরত্ন' কাদের বলা হয় ? কয়েকজন রত্নের নাম কর।
৩৯। কোন্ অঞ্চলের নাম হয়েছিল পুণ্ড্রদেশ এবং কেন ?
৪০। কোন্ দ্বীপের নাম সিংহল রাখা হয়েছিল এবং কেন ?
৪১। একজন বিখ্যাত চীন পরিব্রাজকের নাম কর।
৪২। ফা-হিয়েন কে ? তিনি কার রাজত্বকালে এদেশে এসেছিলেন ?
৪৩। কুষাণ যুগের কয়েকটি শহরের নাম কর।
৪৪। গান্ধার শিল্প কি ?
৪৫। অশ্বঘোষ কে ছিলেন ? তিনি কি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ?
৪৬। কালিদাস কোন্ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? তাঁর লেখা কয়েকটি কাব্যের নাম কর।
৪৭। গুপ্তযুগের কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের নাম কর।

৪৮। গুপ্তযুগে ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কে ছিলেন ?
৪৯। ব্রহ্মগুপ্ত কে ছিলেন ? তিনি কিজন্য বিখ্যাত ?
৫০। গুপ্তযুগে চিকিৎসা ও রসায়নবিদ্যা কে শুরু করেন ?
৫১। প্রাচীন ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।
৫২। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল ?
৫৩। নালন্দার প্রধান অধ্যাপকের নাম কি ছিল ?

ঠিকমত সাজাও :

(১) উত্তর ভারতের আর এক নাম	(১) ইন্দ্র।
(২) আর্য সমাজের কর্তা ছিলেন	(২) তীর্থস্থান।
(৩) আর্যদের বজ্রের দেবতা ছিলেন	(৩) বেদব্যাস।
(৪) মহাভারতের রচয়িতা ছিলেন	(৪) পুরুষরা।
(৫) কুরুক্ষেত্র হিন্দুদের একটি	(৫) আর্যাবর্ত।
(৬) শাক্যবংশের রাজা ছিলেন	(৬) ত্রিপিটক।
(৭) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম	(৭) উপনিষদ্।
(৮) মেগাস্থিনিস এসেছিলেন	(৮) শুদ্ধোধন।
(৯) বৈদিক যুগের শেষদিকে রচিত হয়েছিল	(৯) আর্যভট্ট।
(১০) তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম	(১০) চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়।
(১১) পৃথিবী গোলাকার প্রমাণ করেন	(১১) শূদ্রক।
(১২) গুপ্ত যুগের এক কবির নাম	(১২) পাণিনি।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) আর্যদের মধ্যে — পূজার প্রচলন ছিল না।
(খ) বৈদিকযুগে যাঁরা খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন তাঁরা — ও —যজ্ঞ করে তাঁদের ক্ষমতা প্রচার করতেন।
(গ) প্রাচীন ভারতের দুখানি মহাকাব্যের নাম — ও —।
(ঘ) রামায়ণের রচয়িতা ছিলেন—।
(ঙ) —কে পঞ্চম বেদ বলা হয়।
(চ) রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ছিলেন যথাক্রমে — ও —।
(ছ) সিদ্ধিলাভের পর বর্ধমানের নাম হয় —।
(জ) সিদ্ধার্থ ছিলেন — এর পুত্র।
(ঝ) বুদ্ধ কথাটির অর্থ —।

(ঞ) মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধদেব যে পথ দেখিয়েছিলেন তার নাম — —।
(ট) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক সিংহলে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পুত্র — ও কন্যা — কে।
(ঠ) — সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত — বংশ ধ্বংস করে — এর সিংহাসন লাভ করেন।
(ড) সিংহলের রাজা — সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন।
(ঢ) মধ্য এশিয়ার এক বর্বর জাতির নাম —।
(ণ) নন্দবংশের সর্বশেষ রাজার নাম —।
(ত) — পাটলিপুত্রের একটি খুব বড় দাতব্য চিকিৎসালয় দেখেছিলেন।
(থ) — এর সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন —।

কোন্‌টি ঠিক বল ঃ

(ক) উত্তর ভারতের আর এক নাম ছিল দাক্ষিণাত্য/আর্যাবর্ত।
(খ) আর্যদের এক প্রধান দেবতার নাম ছিল শিব/অগ্নি/রাহু।
(গ) মহাভারতের রচয়িতার নাম বাল্মিকী/চরক/বেদব্যাস।
(ঘ) মহাবীরের পিতা উত্তর বিহারে রাজত্ব করতেন শ্রাবস্তীপুরে/বৈশালীর নিকটে।
(ঙ) মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন কণিষ্ক/বুদ্ধদেব/হর্ষবর্ধন।
(চ) বুদ্ধদেব বেদ মানতেন/মানতেন না।
(ছ) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্কন্দগুপ্ত/চন্দ্রগুপ্ত।
(জ) কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বুদ্ধগুপ্ত/কণিষ্ক/বিম কদফিস।
(ঝ) গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত/সমুদ্রগুপ্ত/২য় বিক্রমাদিত্য।
(ঞ) নবরত্ন ছিলেন ২য় চন্দ্রগুপ্তের সভায়/বিক্রমাদিত্যের সভায়।
(ট) লঙ্কা দ্বীপের নাম ছিল শিলং/সিংহল/ব্রহ্মদেশ।
(ঠ) কণিষ্কের রাজবৈদ্যের নাম আর্যভট্ট/চরক/সুশ্রুত।
(ড) রাজগীরের নিকট অবস্থিত ছিল নালন্দা/তক্ষশীলা।
(ঢ) নালন্দায় অধ্যয়ন করত দশ হাজার ছাত্র/পাঁচ হাজার ছাত্র।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। আর্যরা কিভাবে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে ?
২। আর্য সভ্যতায় নারীর স্থান কি ছিল ?
৩। আর্যদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি জান ?
৪। আর্যরা কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা করত ?
৫। কুরুক্ষেত্রে কি ঘটেছিল ? কুরুক্ষেত্র হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান কেন ?

৬। রামায়ণ ও মহাভারত কিরূপ জনপ্রিয় হয়েছিল ?
৭। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন্ কোন্ চরিত্র ভারতবাসীর জীবনের আদর্শ ?
৮। বৈদিক ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার কারণ কি ছিল ?
৯। অষ্টাঙ্গিক মার্গ কাকে বলে ?
১০। অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ?
১১। চন্দ্রগুপ্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
১২। চন্দ্রগুপ্ত কতদূর রাজ্য বিস্তার করেন ?
১৩। অশোক কেন স্থির করলেন যে জীবনে তিনি আর যুদ্ধ করবেন না ?
১৪। কণিষ্ক কে ছিলেন ? তিনি কতদূর তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন ?
১৫। মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজে কয়টি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন ?
১৬। মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন সম্বন্ধে কি বলেছেন ?
১৭। গুপ্তযুগে অস্পৃশ্যদের ওপর কেমন ব্যবহার করা হতো ?
১৮। মেগাস্থিনিস ভারতবাসীর সাধুতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা কি ঠিক ?
১৯। গান্ধার শিল্প কাকে বলে ?
২০। গুপ্তযুগে বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে কি জান ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। আর্যদের সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান ?
২। আর্যদের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা কেমন ছিল ? গণরাজ্য কাকে বলে ?
৩। রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়বস্তু কি ছিল ? এই দুইটি মহাকাব্য ভারতবাসীর জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল ?
৪। সিদ্ধার্থ কিভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন ? তিনি কোন্ কোন্ নগরে ধর্মপ্রচার করেছিলেন ?
৫। গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লিখ। 'ত্রিপিটক' কি ?
৬। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সারা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয়েছিল কিভাবে ? চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান ?
৭। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে কি জান ?
৮। বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ? মধ্য এশিয়ায় কিভাবে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে ?
৯। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কি জানা যায় ?
১০। গুপ্তযুগে ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উন্নতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

———

বিদেশের সব সেরা বইগুলির সহজ-সরস অনুবাদ

[ছোটদের জন্য]

ডেভিড কপারফিল্ড	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.৫০
অলিভার টুইস্ট	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.০০
গালিভার্স ট্র্যাভেল্স্	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.০০
রবিন হুড	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.০০
দি সুইস্ ফ্যামিলি রবিনসন	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৫.০০
টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্স্ আণ্ডার দি সী	অসিতকুমার সরকার	৪.০০
ওয়ার অ্যাণ্ড পীস	অশোক গুহ	৩.০০
ছোট রাজকুমার	ফাদার হুতিয়েন	৪.০০
পিকউইক পেপার্স্	অশোক গুহ	৩.০০
রবিনসন ক্রুশো	অশোক গুহ	৩.০০
অ্যাডভেঞ্চার অব লে ভেরী	বিশু মুখোপাধ্যায়	৩.০০
নীল সাগরের নীচে [ওয়াটার বেবিজ]	'চন্দ্রহাস'	২.৫০
টম্ ব্রাউন্স্ স্কুল ডেজ	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	৩.০০
দি চিলড্রেন অফ্ দি নিউ ফরেস্ট	অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী	৩.০০
হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসেনের গল্প	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩.০০
জার্নি টু দি সেণ্টার অফ্ দি আর্থ	কুঞ্জবিহারী পাল	৩.০০
অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ	প্রদ্যোৎ গুপ্ত	৩.০০
হোয়াইট কোট ডিড্ অ্যাট স্কুল	প্রদ্যোৎ গুপ্ত	৪.০০

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং